# সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

2

# সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড্
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৭০

পাঁচ টাকা



মুদ্রক :
শ্রীশশধর পোদ্দার, বি, এ
শ্রীগুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা-৯

# সূচী


সমাজ, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার ১
ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ৮
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ২৪
গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র ৩৬
কোষগ্রন্থের কথা ৪২
বাংলা বইয়ের একাল ও সেকাল ৫১
জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা ৫৭
আমাদের পাঠ্যপুস্তক ৬৭
অশ্লীলতা-নিবারক আইন ৭৪
রবীন্দ্র-রচনার সমকালীন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ৮০
পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একশত বই ১০৭
গান্ধীজীর পাঠ-চর্চা ১২৪
ভারতের বাংলাভাষী ১৩২

# সমাজ, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তারা বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রগতি-শীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আজকাল একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। পাশ্চাত্যের যে-সব দেশ শিক্ষা এবং শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত সেখানে সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। দেশের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক। গ্রন্থাগার বলতে আমরা সাধারণ গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরির কথা বলছি।

গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সুপ্রাচীন কালেও যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর গ্রন্থাগারের খ্যাতি সুবিদিত। তার পর থেকে বিভিন্ন যুগে আমরা নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থাগার যুক্ত আছে দেখতে পাই। কিন্তু এ সব গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। তখনো গ্রন্থাগার ব্যবহার ও পরিচালনায় সর্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে শুরু করে, এবং ক্রমশঃ এই গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক জীবনের অপরি-হার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে। এর পূর্বে যে সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না, তা নয়। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামে একটি মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি ছিল। ফ্রান্সে পাবলিক লাইব্রেরির অস্তিত্ব ১৭৯১ সাল থেকে পাওয়া যায়। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থাগারকে সমাজিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়ে ব্যাপকভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে য়ুরোপ-আমেরিকায় যে-সব সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল এখন তাদের 'সাব্‌স্‌ক্রিপ্‌শান লাইব্রেরি' নামে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ, পাঠকরা চাঁদা দিয়ে গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়ত। আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে এখনো এ ধরনের গ্রন্থাগারকেই বুঝি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে পাবলিক লাইব্রেরিজ্‌ অ্যাক্ট পাশ হবার পর থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনে নবযুগের সূত্রপাত হয়। অবশ্য এর পূর্বে আমেরিকায় লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে কয়েকটি আইন হয়েছিল।

কিন্তু সেই আইনগুলি আঞ্চলিক উদ্দেশ্যে রচিত, সুতরাং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা গ্রন্থাগারের ইতিহাসে ক্রান্তিকাল বলে নির্দেশ করতে পারি।

১৮৫০ সালের গ্রন্থাগার আইন এখানে বিচার্য নয়। পূর্বে আমরা বলেছি যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি ও প্রসার লাভ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের এমন রূপান্তর ঘটল যার ফলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ১৮৫০ সালের গ্রন্থাগার আইনের মধ্যে সেই অপরিহার্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে অনুভূত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়; পাশ্চাত্যের জাতিগুলি বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় তাদের প্রভুত্ব সুদৃঢ় করতে থাকে; নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সাধারণ মানুষ কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের হাত থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়ে অবসর বিনোদনের উপায় খুঁজতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হওয়ায় দারিদ্র্যের পীড়ন বহুলাংশে লঘু হয়ে পড়ে; তাই তাদের মন নতুন চিন্তা ও ভাবনা গ্রহণের উপযোগী হল। ফরাসী বিপ্লব নিয়ে এল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর এটাই সবচেয়ে বড় দান।

কল-কারখানায় কাজ করতে, অন্য দেশ জয় করতে, এবং বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করতে শিক্ষার প্রয়োজন। শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের শিক্ষিত হলেই চলবে না, প্রত্যেকেরই এমন শিক্ষা চাই যার দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করতে পারে। বিজ্ঞানের দানকে গ্রহণ করবার জন্য এইটুকু শিক্ষা প্রয়োজন। ফরাসী বিপ্লব যে গণতন্ত্রের আদর্শ আমাদের দিয়েছে, তাকে সফল করবার জন্যও প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা দরকার। শিক্ষার সাহায্যে বিচারবুদ্ধিকে যদি সদাসচেতন রাখা না হয় তাহলে গণতন্ত্র দূর হয়ে আবার রাজতন্ত্র নতুন রূপে দেখা দেবে। গণতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক নাগরিককে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া। সেই সুযোগ গ্রহণের প্রবেশপত্র শিক্ষা।

প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ যখন অবহিত হল তখনই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কয়েক বছরের,

গ্রন্থাগার শিক্ষার সুযোগ দিতে পারে সারা জীবন। পাঁচ সাত বছর পড়াশুনা করে বিদ্যালয় ছেড়ে বাইরে আসবার পর ক্রমশঃ চর্চার অভাবে আবার অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে যেতে হয়। সুতরাং সময় ও অর্থ দুই-এরই অপচয় ঘটে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে এসে যারা বই পড়বার সুযোগ পায় তারা যে শুধু লেখাপড়ার চর্চা অব্যাহত রাখে তা-ই নয়, তাদের শিক্ষার মান বই পড়ে পড়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তাছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের কয়েক বৎসরের পাঠক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা চলে না, শিক্ষার ধারা অব্যাহত ভাবে সারা জীবন ধরে চলবে। একমাত্র গ্রন্থাগারই এ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরির আদর্শ মোটামুটি যা স্থির হয়েছে তা এই ঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের নিঃশুল্ক বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নেই, আর নেই কোন বাঁধাধরা পাঠক্রম। যার যে বই বা যে বিষয় যতদিন খুশি ততদিন সে পড়তে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগার চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে নাটক, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি সরবরাহ করবে। অবসর যাপনের সর্বাপেক্ষা রুচিসম্মত উপায় গল্প, উপন্যাস ও নাটক পাঠ। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করা যায়।

শুধু চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বই সরবরাহ করে না। এই বিজ্ঞানের যুগে নিছক বেঁচে থাকবার জন্যও বইয়ের প্রয়োজন। বই যখন সহজলভ্য ছিল না তখন জীবিকার পাঠ গ্রহণ করা হত গুরুর কাছে। অর্থাৎ গুরুর কাছে শাগ্‌রেদি করে কবিরাজ, কামার, কুমার ইত্যাদি তাদের বৃত্তির শিক্ষা গ্রহণ করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গুরু ছিলেন পিতা কিংবা পরিবারের কোনো বয়স্ক ব্যক্তি। এই কারণে পূর্বে বৃত্তি ছিল বংশগত। কিন্তু এখন গুরুবাদ আর নেই। একমাত্র সম্বল বই। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার মিস্ত্রি, ফিটার প্রভৃতি বইয়ের সাহায্যে তাদের বৃত্তিগত কুশলতা আয়ত্ত করে। যারা এসব বিষয়ে স্কুলে কলেজে পাঠ গ্রহণ করেছে, তাদেরও প্রধানতঃ বইয়ের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে কাজের পদ্ধতিতে কত পরিবর্তন ঘটছে। সেই আবিষ্কারগুলির সঙ্গে পরিচিত না থাকলে বৃত্তির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়। গ্রন্থাগার বৃত্তিমূলক পুথিপত্র সরবরাহ করে নাগরিকদের জীবিকার্জনেও সহায়তা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রন্থাগার পাঠকদের লঘু সাহিত্যের বই ও পত্রিকা সরবরাহ করত। কিন্তু এখন গ্রন্থাগার শুধু চিত্তবিনোদনের কেন্দ্র নয়, জীবিকার্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বইপত্রও পাঠকদের সরবরাহ করে। তাই গ্রন্থাগারের সঙ্গে জনসাধারণের প্রয়োজনের সম্পর্ক, সুতরাং নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

নানা দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়বার সুযোগ পেয়ে পাঠকরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। গণতন্ত্র সফল করতে গ্রন্থাগারের দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত, দায়িত্বশীল, রুচিবান ও সচেতন নাগরিক গণতন্ত্রের সম্পদ। একমাত্র গ্রন্থাগারই এরূপ নাগরিক গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

গ্রন্থাগারের আর্থিক ও সামাজিক মূল্য ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নে এর দানও যথেষ্ট। বই পড়বার অবাধ সুযোগ পেয়ে নাগরিকদের মন উদার ও কৃষ্টিসম্পন্ন হয়। বর্তমান যুগে কালচার ও গ্রন্থাগার ক্রমশঃ অভিন্ন হয়ে পড়ছে।

উপরে আমরা গ্রন্থাগার প্রসার ও উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কি করে সৃষ্টি হয়েছিল তার আলোচনা করেছি। কিন্তু শুধু উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে কি হবে? গ্রন্থাগারের জন্য বই চাই। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপে মুদ্রণের সূত্রপাত হয়, তথাপি যথেষ্ট সংখ্যক সুমুদ্রিত পুস্তকের জন্য কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে নানা প্রকার যান্ত্রিক উন্নতির ফলে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার তাগিদটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারের নতুন মূল্য দেখা দিয়েছে। এই মূল্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ অবহিত ছিলাম না। জনসংযোগের যে কটি উপায় বর্তমানে সুপ্রচলিত তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার একটি মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রন্থাগার ছিল প্রধান উপায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্রমোন্নতির ফলে সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশান ম্যাস্ কমুনিকেশানে গ্রন্থাগারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই গ্রন্থাগার পশ্চাতে পড়ে গেছে এ কথাও স্বীকার করতে হবে। এ ছাড়া আছে সংবাদপত্র। জনসংযোগের এসব উপায়ের প্রধান সুবিধা এই যে, একই সঙ্গে এক ধরনের সংবাদ বা প্রমোদ বহু লোকের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায়। সুতরাং

প্রচারকে প্রমিত করা (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশান) সম্ভব। সরকার কিংবা অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী অতি সহজেই জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। আর এই প্রচারের পিছনে যদি সরকারের ক্ষমতার বিস্তারের অভিপ্রায় থাকে তাহলে জনসংযোগের আধুনিকতম যন্ত্রগুলি সমাজের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠা সম্ভব। সম্ভব এই জন্য যে, জনসাধারণ বই পড়ার চেয়ে অনেক সহজে এবং বিন্দুমাত্র আয়াস ছাড়াই সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশানের দান গ্রহণ করতে পারে। সংবাদপত্র একটু কষ্ট করে পড়তে হয়। কিন্তু সে কষ্ট সামান্য। বই পড়তে পাঠকের প্রস্তুতি প্রয়োজন; নিরক্ষর বই পড়তে পারে না, কিন্তু সিনেমা দেখতে বা রেডিও শুনতে তার বাধা নেই। প্রত্যেকটি বই পাঠকের মনকে একটি বিশেষ ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই ভাবধারা তাকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে। এমন কি উপন্যাস পড়বার সময়ও পাঠককে কাহিনীর ছবিগুলি মনে মনে আঁকতে হয়। অর্ধেক লেখক সৃষ্টি করে, বাকী অর্ধেক করে পাঠক। তা না হলে পড়া সার্থক হতে পারে না। সিনেমার পর্দায় যখন ছবি দেখি তখন আমাদের মন নিষ্ক্রিয় থাকে, কল্পনা বিস্তার করে পাত্র-পাত্রী ও দৃশ্যপট মনের সম্মুখে রূপায়িত করবার প্রয়োজন হয় না; সিনেমা পরিচালক আমাদের হয়ে সব কিছু করে দিয়েছে, শুধু চোখ খুলে তাকিয়ে থাকলেই হল। বই পড়বার জন্য যে মানসিক পরিশ্রম অপরিহার্য, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশানে তার প্রয়োজন নেই। আমরা স্বভাবতঃই আয়াসপ্রিয়; দৈহিক বা মানসিক কোনো পরিশ্রমই করতে চাই না। সুতরাং সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশানের দিকে সাধারণ লোক ঝুঁকছে। তার-পরেই সংবাদপত্রের স্থান। অতি সহজে পড়ে অতি সহজেই ভোলা যায়।

জনসংযোগের এই শক্তিশালী উপায়গুলি যাদের করায়ত্ত তারা জনসাধারণের মানসিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে একটি বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী দেশের লোকের উপর চাপাতে চাইবে তা আর বিচিত্র কি! যন্ত্রের সাহায্যে একই আকারের লক্ষ লক্ষ পেটেণ্ট বড়ি যে ভাবে তৈরী করা হয়, রেডিও-সিনেমা-টেলিভিশান-সংবাদপত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মনও তেমনি এক ছাঁচে গড়ে তোলা হবে,—এই আশঙ্কা সমাজবিজ্ঞানীদের আজকাল ভাবিয়ে তুলেছে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, গাছপালা, পশুপাখি এবং মানুষ সবাই প্রাণ ধারণ করে। মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে শুধুই প্রাণ ধারণ করে না, মননের দ্বারা

বেঁচে থাকে। মানুষ যদি চিন্তাশক্তি এবং ব্যক্তিত্ব সিনেমা-রেডিও-টেলিভিশান-সংবাদপত্রের কাছে বিসর্জন দেয়, তাহলে গণতন্ত্রের আদর্শ কেমন করে সফল হবে? আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঁচবে কোন উপায়ে?

একমাত্র ভরসাস্থল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারকে আরো লোভনীয় করে তুলতে হবে; সমাজে গ্রন্থাগারের প্রভাবকে সর্বব্যাপী করে তোলাও অত্যাবশ্যক। বই মানুষের মনকে সচেতন করে রাখে, এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারের কোনো প্রভাব থাকে না; জনসাধারণই তাদের প্রয়োজনানুসারে গ্রন্থাগার পরিচালনা করে। প্রত্যেক পাঠকের ব্যক্তিগত রুচিকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগার গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ম্যাস কমুনিকেশানের যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি যে বিপদের সূচনা করেছে, সেই বিপদ অনেকাংশে এড়ানো যেতে পারে সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহায়তায়। পশ্চাত্যের সমাজসেবীরা এ বিষয়ে সচেতন; তাঁরা গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য করছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে? যে ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা আমরা বলেছি ভারতে তেমন গ্রন্থাগার একটিও নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। ইউনেস্কোর সহায়তায় দিল্লীতে একটি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিণত হতে এখনো অনেক দেরী। অথচ সাধারণ গ্রন্থাগার শুরু করতে আমরা বিলম্ব করিনি। ১৮৩৫ সালে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সূত্রপাত হয়েছিল। আমরা যথাসময়ে আরম্ভ করেছি, কিন্তু শতাধিক বৎসরেও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি। পারিনি নানা কারণে। পরাধীনতা, নিরক্ষরতা, দেশীয় ভাষায় বইয়ের অভাব এবং দারিদ্র্য গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। গ্রেট ব্রিটেন গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি বৎসর মাথাপিছু প্রায় সাড়ে তিন টাকা ব্যয় করে। আমরা এক টাকা করে ব্যয় করবার কথাও কি ভাবতে পারি? তাহলে বছরে শুধু গ্রন্থাগারের জন্যই প্রায় চুয়াল্লিশ কোটি টাকা লাগবে। টাকা যদি বা সংগ্রহ করা যায় তাহলেও বই কোথায়? ভারতীয় ভাষায় এমন বই ক'খানা বের হয় যা গ্রন্থাগারের পাঠকদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের জন্য রাখা যেতে পারে? সুতরাং আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বে জাতির আর্থিক উন্নতি, শিক্ষার প্রসার এবং ভারতীয় ভাষায় সকল বিষয়ের বই প্রকাশ অত্যাবশ্যক। এখন শহর অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে; পল্লী অঞ্চলে স্থাপিত হবে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র।

আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিলম্ব ঘটবে বলে ম্যাস কমুনিকেশানের যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবলতর আঘাত হানবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর; যারা বই পড়তে সক্ষম তাদেরও বই পড়বার সুযোগ নেই। সুতরাং সিনেমা-রেডিও-সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধান প্রভাব থেকে, চিন্তাভাবনার একীকরণের প্রচেষ্টা থেকে জনসাধারণ রক্ষা পাবে কোন উপায়ে?

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এই সমস্যাটি এখনো যথেষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

# ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা আর শুধু বণিক রইলো না, তারা দেশের শাসকও হল। এর ফলে ভারতের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটল। এতদিন বণিক হিসাবে তারা পণ্যদ্রব্যের সন্ধান রেখেছে, দেশের মানুষের খোঁজ করেনি। একে তো খোঁজ করবার দরকার ছিল না; তার উপর একটা বাধাও ছিল। ভাষার বাধা। তখন সরকারী কাজকর্মের ভাষা ছিল ফার্সী, বিদেশী বণিকদেরও সেই ভাষা ব্যবহার করতে হত। কিন্তু ফার্সী জনসাধারণের ভাষা ছিল না। সুতরাং দেশের লোক এবং তাদের সংস্কৃতির পরিচয় লাভের সুযোগ হয়নি।

ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে ইংরেজ তরুণরা কোম্পানীর চাকরি নিয়ে অর্থের লোভে ভারতে আসত। তারা লেখাপড়া জানত কম, স্বদেশে ভবিষ্যৎ ছিল না। ভাষার বাধা অতিক্রম করে নতুন দেশের সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করবার মতো যোগ্যতার অভাব ছিল তাদের মধ্যে। দেশ শাসনের দায়িত্ব লাভের পর শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্যতর লোকের প্রয়োজন হল। একে একে শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ইংরেজরা ভারতে আসতে আরম্ভ করলেন। নতুন দেশকে জানবার কৌতূহল তো তাঁদের ছিলই, তার উপর সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্যও শাসিতের সঙ্গে পরিচয়টা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড় দেশ কৌশলের সঙ্গে অধিকার করেছে। কৌশল প্রয়োগের জন্য প্রতিপক্ষের রীতি-নীতি জানা দরকার।

ইংরেজ পণ্ডিতরা প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা শুরু করেছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে। এটা স্বাভাবিক ছিল। কারণ, মুসলমান রাজত্বের প্রভাব তখনো দূর হয়নি। কিন্তু শীগ্‌গীরই শাসক সম্প্রদায় বুঝতে পারল ফার্সী ভাষা ও মুসলমান আমলের ঐতিহ্য সত্যিকার ভারতকে জানতে সাহায্য করবে না। সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে।

১৭৭৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে নিয়মিতভাবে ভারতীয় বিদ্যা চর্চার সূচনা হয়। হেস্টিংস স্থির করলেন যে, ভারত শাসনের জন্য ব্রিটিশ আইন প্রয়োগ করা হবে না; ভারতীয়েরা তাদের প্রাচীন আইন অনুসারেই শাসিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার জন্য আইনের সংস্কৃত পুথিগুলির অনুবাদ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ইংরেজ বিচারকরা সংস্কৃত শেখেননি, জানতেন

ফার্সী, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা প্রথম সংস্কৃত পুথির ফার্সী অনুবাদ করলেন। ইংরেজীতে অনুবাদ করবার ক্ষমতা পণ্ডিতদের তখনো হয়নি। এমনি করেই এদেশে সংস্কৃত চর্চার শুরু হয়।

আইনের অনুবাদ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখে গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশে কোম্পানী ১৭৮৫ সালে এই অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ১৫৬ পৃষ্ঠার অনুবাদ পুস্তকটি বিদেশীদের নিকট এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের পরিচয় বহন করে আনল। এর এক বছর পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। 'শকুন্তলার' ইংরেজী অনুবাদ জোন্সের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে শুধু ধর্মগ্রন্থ নেই, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যও আছে। সরকারী কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজন হল আধুনিক ভারতীয় ভাষা চর্চা করবার। খ্রীষ্টান পাদ্রিদের ধর্ম প্রচারের উপযোগী মাধ্যমও হল চলিত ভাষা। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা বিভিন্ন ভাষা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতের ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি শিক্ষা দেবার জন্য দুটি কলেজ স্থাপিত হল। একটি হেইলবারিতে, আর একটি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এর ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা নিয়মিত হল এবং বিস্তৃতি লাভ করল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘোষণার পর থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হল। এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরেজদের মনে জাগল আবিষ্কারের কৌতূহল। পুথি, ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদি ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি ইংরেজ কর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করতে লাগল। আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। বিনামূল্যে বিদেশীদের হাতে দুর্লভ নিদর্শনগুলি তুলে দিয়েছি। বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ কর্মচারীরা সংগৃহীত পুথিপত্র এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষণের জন্য দিয়েছেন। যারা নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পুথি, ছবি, মূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করত, তারা এগুলো দেশে নিয়ে মূর্তি দিয়ে বাগান সাজাত এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিউরিয়ো হিসাবে উপহার দিত বন্ধুবান্ধবদের। প্রত্যেক জাহাজে অসংখ্য নিদর্শন ইংলণ্ড চলে যেত, তারপর সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ত যে সন্ধান রাখা সম্ভব হত না। সাধারণ ইংরেজ পরিবারে এদের মূল্য ছিল না। কিছুদিন

পরে জঞ্জাল মনে করে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলি ফেলে দেওয়া হত। 'ওরিয়েন্টাল মিসেলেনি (১৭৯৮)' থেকে জানা যায় ১৭৯৩ সালে লেডি চেম্বার্স বাংলা দেশ থেকে একটি সচিত্র সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমানে এই পুথির অস্তিত্ব সম্বন্ধে হদিস পাওয়া যায় না। এরূপ অসংখ্য পুথিপত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকে অবশ্য সযত্নে রক্ষা করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকত বলে ভারতীয় বিদ্যা চর্চায় এই সব পুথিপত্রের সাহায্য পাওয়া যেত না।

সুখের বিষয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৭৯৪ সালের ২৫শে মে তারিখের এক পাবলিক লেটারে তাঁরা বলেন:

"We understand it has been of late years a frequent practice among our servants, especially in Bengal, to make collections of Oriental Manuscripts, many of which have afterwards been brought into this country. By the accidents of time, and the exportation of many of the best manuscripts, a progressive diminution of the original stock, Hindustan may at length be much thinned of its literary stores without greatly enriching Europe. To prevent in part this injury to letters, we have thought that the Institution of a public Repository in this country for Oriental Writings would be useful, and that a thing professedly of this kind is still a bibliothecal desideratum here...We think the India House might with particular propriety be the centre of an ample accumulation of that nature."

কেউ কেউ মনে করেন যে, কোম্পানীর নিজস্ব ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মের আগ্রহে ডিরেক্টর সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অর্ম ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির উপর তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। মেকলে বিদ্রূপ করে বলতেন, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে কখানা ক্লাসিক বই একটি তাকের উপরে রাখা যায় তাদের মূল্য প্রাচ্যের সমগ্র সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু অর্ম তাঁর বন্ধুমহলে বলতেন যে, ভারতের মৌলিক ও মূল্যবান পুথিগুলি ব্রিটেনে আনতে সম্পূর্ণ একটি বড় জাহাজের প্রয়োজন হবে।

কোম্পানী কর্মচারীদের পুথিপত্র এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন হেড আপিসে জমা দেবার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশের পশ্চাতে গ্রন্থাগার স্থাপনের কোনো

পরিকল্পনা ছিল না; শুধু ভারতীয় সভ্যতার চিহ্নগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করে রাখা এবং দাতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা ছিল উদ্দেশ্য। ডিরেক্টরবর্গ সুস্পষ্টরূপেই বলেছেন যে, এই সংগ্রহশালাকে ব্যবহারের উপযোগী করবার জন্য তাঁরা একটি পয়সাও ব্যয় করবেন না।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল পুথিপত্রের গুদাম সৃষ্টি করা। স্যার চার্লস উইলকিন্সের ঐকান্তিক আগ্রহে গুদাম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল। উইলকিন্সের উৎসাহ ছাড়া ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি স্থাপিত হত কি না সন্দেহ।

উইলকিন্স সমারসেট জেলার অন্তর্গত ফ্রম-এ ১৭৪৯ অথবা ১৭৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে চাকরি নিয়ে তিনি বাংলা দেশে আসেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আয়ত্ত করেলেন ফার্সী ও বাঙলা ভাষা। ১৭৭৮ সাল থেকে উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেন। মাত্র সাত বছর পরে তিনি গীতার ইংরেজী অনুবাদ সমাপ্ত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এর পর উইলকিন্স আরম্ভ করলেন মনুসংহিতার অনুবাদ। যখন এক তৃতীয়াংশ অনুবাদ হয়েছে তখন স্যার উইলিয়াম জোন্স অনুবাদ সম্পূর্ণ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। উইলকিন্স তাঁর হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। ১৭৯৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্সের নামে Institutes of Hindu Law প্রকাশিত হল। এই ব্যাপারে উইলকিন্স নিজের নাম প্রচারে যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

উইলকিন্স সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক। কিন্তু বাঙালীর নিকট তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙলা টাইপের আবিষ্কর্তা হিসাবে। হালহেড সাহেবের A Grammar of the Bengal Language ( 1778 ) প্রকাশ করবার সময় ব্যাকরণে উধৃত বাঙলা দৃষ্টান্তগুলি মুদ্রণের সমস্যা দেখা দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে উইলকিন্স বাঙলা হরফ প্রস্তুত করেন এবং তাঁর সহকর্মী পঞ্চানন কর্মকারকে কৌশলটি শিখিয়ে দেন। উইলকিন্স বাংলা মুদ্রণের জনক, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা দেশের আবহাওয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। ষোল বছর এদেশে চাকরি করবার পর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি সংস্কৃতের চর্চা নিয়ে ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে কতকগুলি অনুবাদ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজের জন্য একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করবার পর ১৭৯৬ সালে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে উইলকিন্সের বাড়ী,

নগদ টাকা-কড়ি, বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উইলকিন্স বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়লেন; তাড়াতাড়ি একটা চাকরি চাই। কোম্পানীর প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার কথা শুনে তিনি তত্ত্বাবধায়কের পদের জন্য আবেদন করলেন। ভারতীয় বিদ্যায় তাঁর মতো পারদর্শী তখন ব্রিটেনে কেউ ছিল না। সুতরাং উইলকিন্সের বিশ্বাস ছিল এ কাজের তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস আবেদনপত্র পেয়ে তাঁকে লিখলেন, তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে প্রস্তাবিত ওরিয়েণ্টাল রিপজিটারি বা ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়াম কিভাবে তিনি গড়ে তুলবেন তার পরিকল্পনা পেশ করতে। উইলকিন্স ওরিয়েণ্টাল রিপজিটারি বা প্রাচ্য সংগ্রহশালার যে পরিকল্পনা পেশ করলেন তাতে মোটামুটি চারটি বিভাগ ছিল: (১) গ্রন্থাগার, (২) মিউজিয়াম, (৩) প্রকৃতিজাত ও (৪) শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী। প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুথিপত্র, ম্যাপ, চার্ট, ছবি, মূর্তি, ঐতিহাসিক লিপি, মুদ্রা এবং যে সব দেশের সঙ্গে কোম্পানীর বাণিজ্য আছে সে-সব দেশের পণ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহের ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল উইলকিন্সের। রাণীগঞ্জের কয়লা এবং বীরভূমের পোর্সিলিন মাটির নমুনা সংগ্রহের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

ডিরেক্টর সভা উইলকিন্সের পরিকল্পনা পেয়েও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। উইলকিন্স কয়েক মাস অপেক্ষার পর নিরুপায় হয়ে তাঁর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট সাহায্যের আবেদন করলেন। হেস্টিংস কলকাতা থেকে চিঠি দিলেন উইলকিন্সের আবেদন সমর্থন করে। বোর্ডের সভায় চিঠি পড়া হল, কিন্তু কোনো কাজ হল না। বোর্ডের সভাপতি হেনরি ডাণ্ডাস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন; হেস্টিংসের উপরও তিনি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। এই দুটি কারণে প্রত্যেকবারই উইলকিন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু উইলকিন্স হতাশ হবার পাত্র নন; এক বৎসর পরে তিনি আর একবার গ্রন্থাগারিকের পদ প্রার্থনা করে আবেদন করলেন। এবার তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। ইতিমধ্যে ডাণ্ডাস বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছেন। সুতরাং বোর্ড অব ডিরেক্টরস উইলকিন্সের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। ১৮০১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি উইলকিন্সকে বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বেতনে কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়। বর্তমান মূল্যমানে তাঁর মাসিক বেতন ছিল প্রায় দু'শ বাইশ টাকা।

উইলকিন্স যেদিন গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ আরম্ভ করলেন সেদিনই ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হল। লীডেন হল স্ট্রীটে ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস কোম্পানীর

হেড আপিস। সেই বাড়ীর একটি ঘরে উইলকিন্স বইপত্র সাজিয়ে বসলেন। গ্রন্থাগারে কোন পাঠকের প্রবেশাধিকার ছিল না। পুথিপত্র সংগ্রহের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। উইলকিন্সের বেতন ছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য একটা পয়সাও ব্যয় করা হবে না—এই ছিল কোম্পানীর স্থির সিদ্ধান্ত। কর্মচারীরা বিজিত দেশ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে মূল্যবান নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করে ইণ্ডিয়া হাউসে জমা দেবে, এই আশ্বাসে কোম্পানী লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়েছে। প্রথমে কোম্পানীর এই আশা পূর্ণ হয়নি।

লাইব্রেরির 'ডে বুক' বা দৈনিক দানের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম তিনটি হাতীর মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম যে সংস্কৃত পুথি লাইব্রেরিতে পাওয়া গেল সেটি শাহনামার সংস্কৃত অনুবাদ। ডিসেম্বর মাসে মেজর বীটসন দান করলেন The Original Manuscript Record of Tippoo Sultan's Dreams. টিপু তাঁর এই দিনলিপি অত্যন্ত গোপনে রাখতেন। তিনি যে দিনরাত্রি ইংরেজদের এদেশ থেকে কি করে তাড়ানো যায় সে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এ থেকে তার পরিচয় পওয়া যাবে। প্রথম বৎসরের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংযোজন কোম্পানীর ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মের সংগ্রহ। এই সংগ্রহে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ভারত সম্পর্কে ১৯০টি পুস্তিকা ২৩১ খানি পুথি, এবং বহু ম্যাপ, স্কেচ, নকশা, ছবি, চিঠিপত্র ইত্যাদি আছে। মুসলমান রাজত্বের পতন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মূল দলিল পাওয়া যাবে এই সংগ্রহে।

ভারত থেকে পুথিপত্রের আশানুরূপ সরবরাহ না পেয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ১৮০৫ সালের ৫ই জুনের "বেঙ্গল ডেসপ্যাচে" এ ব্যাপারে বাংলা সরকারের উদ্যোগহীনতার অভিযোগ করেন। তাঁরা নির্দেশ দিলেন যে, এখন থেকে বাংলা সরকার এবং কর্মচারীদের বই পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করবার জন্য তৎপর হতে হবে।

আসলে ইংরেজ কর্মচারীরা এবিষয়ে উদাসীন ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হওয়ায় সংগৃহীত জিনিসপত্র সাধারণত এ দুটি প্রতিষ্ঠানেই দেওয়া হত। যাই হোক, বাংলা সরকার কোম্পানীর নির্দেশ অনুসারে ১৮০৬ সালের ২৬শে জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কর্মচারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন। এর পরে লাইব্রেরির পক্ষ থেকে কখনো বইপত্রের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করতে হয়নি।

সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়তে লাগল। উইলকিন্সের একার পক্ষে সামলানো অসম্ভব। একে একে তাঁর অধীনে কেরানী নিযুক্ত হতে লাগল। এদিকে কোম্পানীর সংগ্রহশালার খ্যাতি ব্রিটেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র, গবেষক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছ থেকে এই সংগ্রহ ব্যবহারের জন্য ক্রমাগত আবেদন আসতে লাগল। জনসাধারণের এই দাবী বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত কোম্পানী সংগ্রহশালা ব্যবহার করতে অনুমতি দিলেন। গুদাম হিসাবে যে সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছিল, কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তা গ্রন্থাগারে পরিণত হল।

পুথিপত্র ছাড়া অন্যান্য জিনিসও অবিরাম ধারায় আসতে আরম্ভ করেছে। যে সব দেশে কোম্পানীর ব্যবসা আছে, সে-সব দেশ থেকে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার আসতে লাগল : ঠগ দস্যু দলপতির মাথার খুলি ; স্পিরিটে রাখা সাপ, ব্যাঙ, মাছ ; বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, খনিজ, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একা দুদিক দেখা আর সম্ভব নয় বলে ১৮২০ সালে মিউজিয়াম বিভাগের জন্য একজন কিউরেটার নিযুক্ত করা হল।

১৮৩৬ সালে উইলকিন্সের মৃত্যুর পর বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস হেমান উইলসন গ্রন্থাগারিক হয়ে আসেন। কয়েক বৎসর পরে মিউজিয়াম বিভাগটি লাইব্রেরি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হয়। তাঁর কার্যকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতে কোম্পানীর প্রভুত্বের অবসান। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন ; সেই সঙ্গে কোম্পানীর অন্যান্য সম্পত্তির মতো গ্রন্থাগারটিও কোম্পানীর হাত থেকে খাস গবর্ণমেণ্টের অধীনে চলে যায়। ভারত শাসনের দায়িত্ব পড়ে 'ইণ্ডিয়া আপিস' নামে একটি নতুন দপ্তরের উপর। এই নতুন বিভাগের জন্য বাড়ী চাই। লীডেন হল ষ্ট্রীটের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস দুটী কারণে অনুপযোগী বলে মনে হল। প্রথমতঃ পার্লামেণ্ট হাউস থেকে অনেক দূর ; দ্বিতীয়তঃ, স্থান সঙ্কুলানের মতো বাড়ীটী যথেষ্ট বড় নয়। সুতরাং পর্লামেণ্ট, ডাউনিং স্ট্রীট এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তরের নিকটবর্তী কিং চার্লস স্ট্রীটে সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা দিয়ে তিন বিঘা জমি কেনা হয়। বলা বাহুল্য, জমির দামটা ভারতের রাজস্ব থেকেই দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর নকশা তৈরির ভার পড়ল বিখ্যাত স্থপতি স্যার গিলবার্ট স্কটের উপরে। কিন্তু এই নকশা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। এমন কি, পার্লামেণ্টেও এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইতালিয়ান স্থাপত্যের আদর্শে ইণ্ডিয়া আপিসের বাড়ীটী ১৮৬৭ সালে সমাপ্ত হয়। বাড়ীর উচ্চতা ৯৫ ফুট। যে সব ইংরেজ

কর্মচারী ভারতে কাজ করেছে, বাড়ীর সর্বত্র তাদের মূর্তি ছড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনে যারা সাহায্য করেছে, সেই সব ভারতীয়ের মূর্তিও দেখা যাবে। বাড়ীর অলংকরণ করা হয়েছে ভারতের লতা-পাতা ও ফুল-ফলের নকশা দিয়ে। ইণ্ডিয়া আপিসের ঠিক উল্টো দিকেই সেণ্ট জেমস পার্ক।

এতদিন যা কোম্পানীর লাইব্রেরি বলে পরিচিত ছিল, নতুন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হবার পর তার নতুন নাম হল 'ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি'। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করবার সময় অনেক মূল্যবান পুথিপত্র নাকি জঞ্জাল হিসাবে মন দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক উইলসনের পর ডঃ ব্যালেণ্টাইন, অধ্যাপক হল, ডঃ রস্ট, অধ্যাপক টনি, ডঃ টমাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একে একে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ রা কেউ আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন না; কিন্তু প্রত্যেকেই ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যায় বিশারদ। এঁদের ঐকান্তিক সাধনায় এবং বহু জ্ঞানান্বেষী সংগ্রাহকের সহায়তায় ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি অপূর্ব সম্পদের অধিকারী হতে পেরেছে।

ভারত স্বাধীন হবার পর ইণ্ডিয়া আপিসের দপ্তর বন্ধ হয়েছে। এখন সেখানের কমনওয়েলথ রিলেশানস-এর দপ্তর। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী এখনো সে বাড়ীতেই আছে, এবং যদিও ইণ্ডিয়া আপিস আর নেই, তবু গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক নামটি সুপ্রচলিত আছে। যদিও সরকারীভাবে এর নতুন নাম 'কমনওয়েলথ রিলেশানস্ আপিস লাইব্রেরি'।

গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) মুদ্রিত পুস্তক; (২) পুথি; (৩) ছবি; (৪) ফটোগ্রাফ; (৫) বিবিধ।

মুদ্রিত পুস্তক—১৮৬৭ সালের 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হবার ফলে লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহের ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। এই আইন অনুসারে ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই ও সাময়িক পত্রিকা বিনামূল্যে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই সুযোগ অব্যাহত ছিল। দীর্ঘ আশি বছর যাবৎ ভারতে মুদ্রিত পুস্তকের যে বিরাট সংগ্রহ গড়ে উঠেছে, বর্তমান ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায় তার সাহায্য অপরিহার্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ক্রয় করা হবে,—বহু দিন থেকে এই নীতি অনুসরণ করায় ভারতীয় বিদ্যা সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় পুস্তকই এখানে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। ১৯৩৫-'৩৬ সালে লাইব্রেরির কাজ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল; সেই কমিটির রিপোর্ট থেকে কয়েকটা প্রধান ভাষায় পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া হল:

| | |
|---|---|
| ক। প্রাচীন ( Classical ) ভাষাসমূহ— | |
| আরবী ও ফার্সী | ১০,০০০ |
| সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত | ২২,০০০ |
| তিব্বতী | ১০০ |
| চীনা | ১,৮০০ |
| জেন্দ ও পহ্লবী | ২০০ |
| খ। য়ুরোপীয় ভাষাসমূহ | ৬০,০০০ |
| গ। আধুনিক ভারতীয় ভাষা— | |
| আসামী | ৭০০ |
| বাঙলা | ২৪,০০০ |
| গুজরাটী | ৯,৫০০ |
| হিন্দী | ১৯,৪০০ |
| কানাড়ী | ৩,১৬০ |
| মালয়ালাম | ১,৩৫০ |
| মারাঠী | ৯,২০০ |
| নেপালী | ৩৭০ |
| ওড়িয়া | ৩,৯৫০ |
| পাঞ্জাবী | ৪,৯২৫ |
| পুশতো | ৩১৫ |
| সাঁওতালী | ১২৫ |
| সিন্ধি | ২,৫০০ |
| তামিল | ১৫,২৫০ |
| তেলেগু | ৯,৫০০ |
| উর্দু | ১৯,০০০ |

এ ছাড়া ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের ভাষায় লেখা পুস্তকও আছে। এই রিপোর্ট দাখিলের সময় গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ছিল দু'লক্ষ

ত্রিশ হাজার। এর পর নির্ভরযোগ্য কোন বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজারই ভারত সম্পর্কিত।

গ্রন্থাগারে শুধু 'মূল্যবান' পুস্তকগুলিই সংরক্ষণ করা হয়নি। আপাত দৃষ্টিতে যাদের মূল্য নেই মনে হবে তাদেরও সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। বাঙলা বইয়ের ক্যাটালগের পাতা ওল্টালেই এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে পাঠশালা এবং স্কুলের পাঠ্য বাঙলা বই ও অর্থ পুস্তক লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে একমাত্র ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি সাহায্য করতে পারবে।

পুথি—মোট সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। এর মধ্যে অর্ধেক প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার পুথি। এই হিসাবের মধ্যে তালপাতায়, ভূর্জপত্রে এবং কাগজে লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি ধরা হয়েছে। শতকরা চল্লিশ ভাগ পুথি দান হিসাবে পাওয়া গেছে; ৯,০০০ পুথি ভারত সরকার নানা উপায়ে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। অবশিষ্ট পুথি কেনা হয়েছে। দাতা অথবা সংগ্রহকারীর নাম হিসাবে পুথি বিভাগে প্রায় সত্তরটি পৃথক সংগ্রহ আছে। য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে প্রধানত ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্র, দিনলিপি এবং ভারত সম্পর্কে অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া যাবে। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবেষণায় এসব মৌলিক উপাদান বিশেষ প্রয়োজনীয়। রবার্ট অর্মের সংগ্রহের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া ভারতের ভূতপূর্ব সার্ভেয়ার-জেনারেল ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের পঞ্চাশ খণ্ডে বাঁধানো ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ম্যাসন পেপারস, বুকানন হ্যামিল্টন পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত পুথির সংখ্যা ৮,৬৯৬। কোলব্রুক সংগ্রহকে (২,৭৪৯) সংস্কৃত বিভাগের মেরুদণ্ড বলা যায়। এ ছাড়া স্যার উইলিয়াম জোন্স, হজ্‌সন, টেলর, উইলকিন্স, বার্নেল, বুয়েলার, অফ্রেক্ট, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বরোদার গাইকোয়াড় প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তির সংগ্রহ লাইব্রেরির পুথি বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয় স্যার অরেল স্টেইন সংগ্রহের কথা। স্যার স্টেইনের পূর্ব তুর্কীস্থানে অভিযানের ফলে অনেক সংস্কৃত, খোটানী, তিব্বতী ও কুচিয়ান পুথি আবিষ্কৃত হয়। কতকগুলি সংস্কৃত পুথি খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে একদা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল

এই সংগ্রহ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'বাওয়ার ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট' নামে পরিচিত আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে মূল্যবান পুথি এই অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছিল।

তিব্বতী পুথির সংখ্যা প্রায় এক হাজার ; এ ছাড়া জাইলোগ্রাফ ( কাঠের ব্লক থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ)-এর সংখ্যা ৮০। হজ্‌সন, ডেনিসন রস এবং স্যার অরেল স্টেইন সংগ্রহ এবং ওয়াডেলের লাসা সংগ্রহ ও সেণ্ট পীটার্সবার্গ অ্যাকাডেমির দান এই বিভাগের মূল্যবান সংযোজন।

আরবী ও ফার্সী পুথির সংখ্যা আট হাজারের উপর। টিপু সুলতান, আদিল শা ও দিল্লীর মোগল সম্রাটদের গ্রন্থাগার এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৮১৬ সালে দিল্লী থেকে মোগল সম্রাটদের গ্রন্থাগার ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সংগ্রহে ১,৯৫০ আরবী, ১,৫৫০ ফার্সী এবং ১০০ উর্দু পুথি আছে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষায় প্রায় ১,১০০ পুথি আছে। উর্দু পুথির সংখ্যা ২৬৯, একটি ভাষায় পুথির সর্বোচ্চ সংখ্যা এই। দ্বিতীয় স্থান মারাঠীর, ২৫১টি পুথি আছে মারাঠীতে। বাঙলা পুথির সংখ্যা মাত্র সাতাশ।

এ ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় প্রায় ৩৫০ পুথি আছে। ১৯৫০ সালে মূল্যবান পুথিগুলি যাতে লুপ্ত হয়ে না যায় তার জন্য মাইক্রোফিল্‌ম গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ দু'হাজার পুথির মাইক্রোফিল্‌ম তুলেছেন।

ছবি—ছবির সংগ্রহ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত ; ভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে য়ুরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি। য়ুরোপীয় শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষের, প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং সমসাময়িক ঘটনার ছবি এঁকেছেন। হিন্দুদের দেব-দেবীর ছবিও এঁকেছেন অনেক। তৎকালীন ভারতের সামাজিক জীবনের পরিচয় এই শ্রেণীর ছবির মধ্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভারতের গাছপালা ও জীবজন্তুর ২,৬৪৪ খানি জল রঙের ছবি। লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশে এগুলি আঁকা হয়েছিল।

ভারতীয় রীতিতে এদেশীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির মধ্যে 'জনসন সংগ্রহ' প্রধান। রিচার্ড জনসন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের পোদ্দার। তিনি মোগল আমলের ঐতিহাসিক চিত্র, হিন্দু পুরাণের কাহিনী নিয়ে আঁকা ছবি, রাগমালা ছবি, ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। এসব ছবির মোট সংখ্যা ১,৩০০। মধ্যযুগের

ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনা এই সংগ্রহ বাদ দিয়ে হতে পারে না। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি 'জনসন সংগ্রহ' ক্রয় করেছেন। 'রূপম্' (ষষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯২১) এবং 'নিউ ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' (৪র্থ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৯৪১)-তে 'জনসন সংগ্রহ' সম্বন্ধে দু'টি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক প্রবন্ধ দু'টি থেকে অনেক তথ্য পাবেন।

এ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান পদ্ধতিতে আঁকা আরো অনেক ছবি লাইব্রেরির সংগ্রহে পাওয়া যাবে। আনুমানিক ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারাশুকো তাঁর পত্নী নাদিরা বেগমকে একটি ছবির অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি এখানে রাখা হয়েছে। পুথি চিত্রিত করবার জন্য যে মিনিয়েচার ছবি আঁকা হত লাইব্রেরিতে তাদের সংখ্যা দু' হাজারেরও বেশি।

ফটোগ্রাফ—ভারতের জীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তি প্রভৃতির হাজার হাজার ফটোগ্রাফ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তি সম্বন্ধীয় ফটোগ্রাফের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের উপর। ফটো ব্যতীত ২,৩০০ মূল্যবান নিগেটিভও আছে। ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করতে হলে এই ফটোগ্রাফের সংগ্রহ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিবিধ—বিবিধ দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি ও তাম্রলিপি, ম্যাজিক লণ্ঠনের শ্লাইড, বয়ন শিল্পের নমুনা, ইত্যাদি। গ্রায়ার্সন ভারতের ভাষা সমীক্ষার প্রয়োজনে ভারতের প্রধান ভাষা ও উপভাষাগুলির গ্রামোফোন রেকর্ড করেছিলেন। এই মূল্যবান রেকর্ডগুলি (২১০ খানি) সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে টিপু সুলতানের বাঘের কথা উল্লেখ না করলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকবে। শ্রীরঙ্গপত্তম্ পতনের পর টিপুর প্রাসাদে এই আশ্চর্য কারিগরিসম্পন্ন বাঘটি পাওয়া গিয়েছিল। কোম্পানীর গ্রন্থাগারে বাঘটি আনা হয় ১৮০৮ সালের ২৯শে জুলাই। একটি বাঘ ভূতলশায়ী ইংরেজ সৈনিকের বুকের উপর বসে তার রক্তপানে উদ্যত হয়েছে, একটা হাতল ঘুরালেই বাঘের গর্জনের সঙ্গে মুমূর্ষু ইংরেজের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা যেত। টিপু প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখতেন এবং প্রত্যহ নতুন করে সঙ্কল্প করতেন যে তিনিও বাঘের মতো ইংরেজদের পরাজিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। দর্শকদের নিকট এই মূর্তিটি ছিল পরম বিস্ময়ের বস্তু। সব সময় লোকের ভিড় লেগেই থাকত। ইংরেজ জাতির পক্ষে অপমানজনক বলে সমালোচনা হওয়ার পরে মূর্তিটি 'ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে'

স্থানান্তরিত করা হয়। ভিতরের যন্ত্রপাতি এখন খারাপ হয়ে গেছে, হাতল ঘোরালেও আর শব্দ শোনা যায় না।

ইণ্ডিয়া আপিসের রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয় ১৮৮৪ সালে। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সকল রেকর্ড এখানে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের মৌলিক ঐতিহাসিক নজির এই রেকর্ডগুলি। পৃথক বিভাগ হলেও লাইব্রেরির সংগ্রহকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য এদের প্রয়োজন আছে।

বর্তমান ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির প্রশাসনিক কর্তা সেক্রেটারী অব্ স্টেট। কমনওয়েলথ রিলেশানস আপিস, ভারত ও পাকিস্থানের লণ্ডন হাই কমিশানের দপ্তরের কর্মী এবং ভারত ও পাকিস্থান সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসারবৃন্দ ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে পদাধিকারবলে পড়বার বিশেষ সুযোগ পান। অন্যান্য পাঠকদের অনুমতির জন্য সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট আবেদন করতে হয়। লাইব্রেরির পাঠাগারে পড়বার ব্যবস্থা আছে; তাছাড়া বাড়ীতেও বই নেওয়া যেতে পারে। শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত এবং অন্যান্য দিন লাইব্রেরি সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ। দূরবর্তী স্থানে ডাকে বইপত্র পাঠানো হয়। প্রয়োজন হলে লাইব্রেরির পুথিপত্রের মাইক্রোফিল্ম ও ফটোস্টাট কপি তুলে দেবার ব্যবস্থাও আছে। বেয়ারা ইত্যাদি ছাড়া লাইব্রেরির কর্মীর সংখ্যা ১৩। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবে এখনো লাইব্রেরির সম্পদ সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়নি। এপর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ খণ্ড ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে; কতকগুলি এখন ছাপা হচ্ছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন গ্রন্থাগারটিও হস্তান্তরিত হয়েছিল, তেমনি ভারত স্বাধীন হবার পর ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি আমরা পাব এমন আশা স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু লাইব্রেরি নয়, ইণ্ডিয়া আপিসের রেকর্ড বিভাগের উপরও আমাদের অধিকার আছে। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি সম্বন্ধে এমন কোনো অভিমত প্রকাশ করেননি যা থেকে লাইব্রেরি হস্তান্তর করতে তাঁদের আপত্তি আছে বোঝা যেতে পারে। ভারত ও পাকিস্থান লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একমত হলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করবেন না, এতদিন এই আভাসই পাওয়া গেছে। ভারত ও পাকিস্থানের পারস্পরিক আলোচনা যখন একটি সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ আট বছর পরে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে লর্ড হোম ঘোষণা

করলেন যে, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির উপর তাঁদেরই আইনগত অধিকার, সুতরাং লাইব্রেরি ব্রিটিশ সরকারের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারত পেতে পারে না। তিনি নজির দেখিয়েছেন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। ভারত শাসন আইনে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একথা সত্য। কিন্তু এই ব্যবস্থাটা ছিল সাময়িক। নতুন আইনে সেক্রেটারি অব স্টেট-ইন-কাউন্সিল বাতিল হয়ে যায়। লাইব্রেরি ছিল সপারিষদ সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার অধীনে। সুতরাং লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ভারত শাসন আইন পার্লামেণ্টে আলোচনার সময় স্যার স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেছিলেন যে, লাইব্রেরি যদিও ব্রিটিশ সরকারের পরিচালনাধীনে এসেছে তবু ভারত সরকারের প্রয়োজনেই এর গ্রন্থ-সম্পদ ব্যবহৃত হবে। এবং আরও স্থির হয়েছিল যে, যদি কখনো লাইব্রেরি ভারত সরকারের হাতে দেবার সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেজন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা আইনের খসড়া প্রস্তুত করবার সময় সপারিষদ গভর্নর জেনারেল দাবী করেন যে, লাইব্রেরি ভারতেরই সম্পত্তি। ব্রিটিশ, ভারত এবং পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের বৈঠকে যোগ দেওয়া তখন সম্ভব হয়নি ; সুতরাং কমিটি কোন কাজই করতে পারেনি। তথাপি ব্রিটিশ প্রতিনিধি তাঁর নিজের অভিমত পেশ করে জানিয়েছেন যে, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি লণ্ডনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। ভারত সরকার ইণ্ডিয়া আপিসের বাড়ী এবং লাইব্রেরির উপর তাঁদের দাবী প্রমাণ করবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ এন, পি, চক্রবর্তী এবং কে, ওয়াই, ভাণ্ডারকর। এঁরা ভারতের দাবীর সমর্থনে ইতিহাস ও আইনের নজির খুঁজে পেয়েছেন।

আইনের নজির যদি লর্ড হোমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধেও যায় তবু সেটাই চরম কথা নয় ; শুধু ঐ কারণে ভারতের দাবী শিথিল হবে না। কারণ আমরা তখন পরাধীন ছিলাম ; ব্রিটিশ সরকার কখনো আইনের সাহায্যে, কখনো বা বে-আইনীভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সম্মতি অসম্মতির কোনো মূল্য ছিল না। আইনের কথা বাদ দিলেও ভারতের দাবী আর্থিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইণ্ডিয়া আপিস ভবনটি সম্পূর্ণরূপে ভারতের অর্থে নির্মিত। মোট ব্যয় পড়েছিল প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। ১৯৩৭

সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া আপিস ভবন ও লাইব্রেরির সমুদয় ব্যয় ভারত বহন করেছে। রেকর্ড বিভাগ পরিচালনার জন্যও অর্থ এসেছে ভারতের রাজস্ব থেকে। প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্ট অনুযায়ী যেসব বই লাইব্রেরিতে পাঠানো হত তাদের মাশুল পর্যন্ত ভারত দিয়েছে। স্যার অরেল স্টেইন পুথিপত্র সংগ্রহের জন্য মধ্য এশিয়ায় যে অভিযানে বেরিয়েছিলেন তার জন্য অধিকাংশ অর্থ দেওয়া হয়েছে ভারতের রাজস্ব থেকে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির জন্য যত বই কেনা হয়েছে তার প্রত্যেকটির দাম আমরা দিয়েছি; ইণ্ডিয়া আপিস ভবন নির্মাণ, সংস্কার, আসবাবপত্র, ঘর গরম রাখার জন্য কয়লার দাম, কর্মীদের বেতন প্রভৃতি সকল খরচ দিয়েছে ভারত। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরি পরিচালনার আংশিক ব্যয় ভারতের রাজস্ব থেকে দেওয়া হয়েছে। এত দিনের এত অর্থব্যয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এবং কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, লাইব্রেরিটি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা বিস্ময়কর।

ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির উপর আমাদের নৈতিক অধিকার আছে। এদের মূল্য আমাদের নিকটই সর্বাপেক্ষা বেশি। ভারতের লেখক ও প্রকাশকের দানে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট অনুযায়ী বইপত্র আদায় করে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থের জন্য লণ্ডনে পাঠিয়েছে, কিন্তু ভারতের বই ভারতে রাখবার ব্যবস্থা করেনি। প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শনগুলি ইংরেজরা সুকৌশলে, প্রায় বিনামূল্যে ইংলণ্ডে নিয়ে গেছে। আবার ইংরেজরা যা বিনামূল্যে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে গেছে সেগুলি ভারতের টাকা দিয়ে চড়া দামে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির জন্য কেনা হয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নজিরগুলি ছড়িয়ে আছে; তাদের উপর আজ আর আমাদের অধিকার নেই। একমাত্র ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি আমরা দাবী করতে পারি।

ব্রিটেনে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ব্যতীত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অক্সফোর্ডের বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরি, ইত্যাদি। প্রাচ্যে নবজাগরণের পর থেকে য়ুরোপে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার আগ্রহ অনেকটা কমে এসেছে। আজকাল প্রাচ্যের সমসাময়িক জীবন সম্বন্ধেই প্রতীচ্যের ঔৎসুক্য। পূর্বের মতো ভারত সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সচরাচর য়ুরোপের পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

এতদিন বিদেশী পণ্ডিতরা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন থেকে প্রামাণ্য আলোচনা করবেন ভারতের মনীষীরা; সুতরাং এই আলোচনার জন্য একান্ত আবশ্যকীয় নজিরগুলি ভারতে আনা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের সার্থকতা তার সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বিপুল সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার কখনো হয়নি। লণ্ডনে তা হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ভারতেই লাইব্রেরির বইপত্রের যথার্থ ব্যবহার হতে পারে। এখনো ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি সরকারী দপ্তর সংলগ্ন বিভাগীয় লাইব্রেরির মতো আছে। ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, গড়ে দৈনিক ৩২ জন পাঠক ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির পাঠাগারে পড়তে এসেছে। রবিবার ও ছুটির দিন বাদ দিয়েই এই হিসাব পাওয়া যায়। গড়ে বই ধার দেওয়া হয়েছে ৩০ খানা, তার মধ্যে ভারতীয় ভাষার বই গড়পড়তা ১২ খানা মাত্র। পরবর্তী বৎসরের হিসাবেও এই সংখ্যার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির সম্পদের তুলনায় এই সংখ্যা নগণ্য। ইণ্ডিয়া আপিস প্রকৃতপক্ষে দুর্লভ পুথিপত্র সংরক্ষণের গুদামঘর, এখনো সত্যিকার গ্রন্থাগার হতে পারেনি। এর ফলে ভারতীয় বিদ্যার চর্চা প্রতিদিন ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির নজিরগুলি কাগজ, ভূর্জপত্র, তালপত্র, কাঠ, চামড়া, হাতীর দাঁত, পোড়ামাটি, সোনা, রূপা, তামা, পাথর প্রভৃতির উপর সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, খরোষ্ঠী, খোটানী, বাঙলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির নিভৃত মঞ্চে অপেক্ষা করছে। এদের ভারতে আনতে পারলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো জাতীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করবার প্রচেষ্টা সফল হবে। এসব দুর্লভ অমূল্য নিদর্শন অন্য কোন উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির অভাবে যে ফাঁক থেকে যাবে তার ফলে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য চিরদিন বিদেশী সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে হবে। ভারতের দাবীর পশ্চাতে নৈতিক সমর্থন আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বড় প্রশ্ন যে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি কেন্দ্র করে, সে কথা যেন বিস্মৃত না হই।

# কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালার দানের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। এমন সুব্যবস্থিত সাধারণ গ্রন্থাগার ভারতে পূর্বে ছিল না। এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইংরেজরাও বলেছেন যে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি তদানীন্তন য়ুরোপের যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবের বস্তু হতে পারত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রিটেনে লাইব্রেরি আইন পাশ হয় ১৮৫০ সালে; তারও প্রায় পনেরো বছর আগে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সূত্রপাত হয়।

কলকাতায় সর্বপ্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা নবাগত শাসকদের সামগ্রিক পরিচয় পেতে উৎসুক হয়ে উঠলাম। ইংরেজরাও প্রয়োজনের তাগিদে এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এদেশকে জানতে চাইল। তারই ফলে স্থাপিত হল আমাদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার স্কুল-কলেজ, এবং ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল ইংরেজদের এদেশকে জানবার আগ্রহ। কলকাতায় বইয়ের দোকান স্থাপিত হয়ে নবপ্রকাশিত বিদেশী পুস্তক আমদানী করতে লাগল। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়ে কলকাতা ও শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল ইংরেজী ও বাঙলা বই। শিক্ষায়তন এবং বিদ্বজ্জন সভায় এই সব পুথি-পুস্তক ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের সূচনা করল। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নাগরিকরা বাহির বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল এবং তাদের মনে জাগল পাঠ-স্পৃহা। সুতরাং একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের জন্য পরিবেশ প্রস্তুত হয়েই ছিল।

ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক জে, এইচ, স্টকোয়েলার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, বোম্বাই শহরে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে এই সংবাদ পেয়ে কলকাতায় ঐ ধরনের একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তাঁর মনে হয়। কলকাতার প্রধান প্রধান নাগরিকদের নিকট তিনি এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ১৩৬ জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৮৩৫ সালের অগস্ট মাস গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ সময় কলকাতার নাগরিকদের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য দু'টি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা দেখা দেয়। প্রথমটির উদ্যোক্তরা ২০শে অগস্ট টাউন হলে মিলিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, তদানীন্তন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করায় কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ একটি বৃহৎ ভবন নির্মাণ করে নাম দেওয়া হবে মেটকাফ ভবন। কিন্তু শুধু একটা বাড়ী কি কাজে আসবে? সুতরাং স্থির হল ঐ বাড়ীতে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য।

স্টকোয়েলারের উদ্যোগে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন পীটার গ্র্যান্টের সভাপতিত্বে ৩১শে অগস্ট টাউন হলে কলকাতার নাগরিকদের আর একটি সভা হয়। স্টকোয়েলার সভায় বললেন, সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে কলকাতার নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে উঠবে। ভারতের প্রধান নগরীতে অবিলম্বে এমন একটি কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন যেখানে নাগরিকরা মিলিত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়:

That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation, that shall be open to all ranks and classes without distinction, and sufficiently extensive to supply the wants of the entire community in every department of literature.

এত দিন পূর্বে উদ্যোক্তাদের মনে গ্রন্থাগারের আদর্শ সম্বন্ধে যে ধারণা জেগেছিল বর্তমানের আদর্শ তার সঙ্গে মূলত এক। শ্রেণীনির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গ্রন্থাগার উন্মুক্ত থাকবে, এ কথা ঘোষণা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজ উদ্যোক্তারা উদারতার পরিচয় দিয়েছেন এবং লাইব্রেরির আদর্শের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতেও সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করবার জন্য চব্বিশ জন বিশিষ্ট নাগরিক নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। এই সভ্যদের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন বাঙ্গালী,—'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং হিন্দু কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত। ইংরেজ সভ্যদের মধ্যে উল্লখযোগ্য ছিলেন স্যার জন পীটার

গ্র্যাণ্ট, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন, 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক পাদ্রি মার্শম্যান প্রভৃতি।

কমিটি টাকা সংগ্রহের জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। জনসাধারণের নিকট আবেদন করা হল তিনশ' টাকা দিয়ে গ্রন্থাগারের অংশীদার হতে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই আবেদনে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম অংশীদার হিসাবে আজও উইকস নির্মিত তাঁর আবক্ষ মূর্তি জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

অংশীদার ব্যতীত চাঁদা দিয়ে বই পড়বার জন্য সভ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা হল। সভ্য তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর সভ্যের প্রবেশক কুড়ি টাকা এবং মাসিক চাঁদা ছয় টাকা; দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যের চাঁদা যথাক্রমে চার টাকা ও হু'টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবেশক ছিল ষোল টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যদের প্রবেশক দিতে হত না।

অস্থায়ী কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করবার জন্য ১৮৩৫ সালের ৭ই নভেম্বর টাউন হলে একটি সভা হয়। এই সভায় স্থির হল যে সাত জন কিউরেটারের উপর লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে এবং মিঃ স্টকোয়েলার নির্বাচিত হলেন অবৈতনিক সম্পাদক। পরিচালন কমিটির প্রথম সাতজন কিউরেটার ছিলেন: স্যার এড্ওয়ার্ড রায়ান; ডব্লু, পি, গ্র্যাণ্ট; চার্লস ক্যামেরন; জে, সি, মার্শম্যান; টি, ডিকেন্স; জে, আর, কলভিন এবং এইচ, এম, পার্কার।

মাস তিনেকের মধ্যে অংশীদার ও সভ্যদের নিকট হতে হাজার তিনেক টাকা সংগৃহীত হল। জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া গেল হাজার দেড়েক বই। আর, গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফের মধ্যস্থতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের ৪,৬৭৫টি বই পাওয়া গেল দান হিসাবে। কমিটি টাউন হলে লাইব্রেরির জন্য একটু জায়গার জন্য আবেদন করে ব্যর্থ হলেন। তখন ২৪ পরগনার সিভিল সার্জন ডঃ এফ, পি, স্ট্রং তাঁর ১৩নং এসপ্লানেড রো-এর বাড়ীর একতলাটি লাইব্রেরির ব্যবহারের জন্য দিলেন। এর চেয়ে সুবিধাজনক কোনো জায়গা না পেয়ে এখানেই লাইব্রেরির কাজ আরম্ভ করা স্থির হল। স্ট্যাসি নামক এক ভদ্রলোক গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন; স্যার জন পীটার গ্র্যাণ্টের সুপারিশে খ্যাতনামা লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র নিযুক্ত হলেন সহকারী গ্রন্থাগারিক। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার উন্মুক্ত হল ২১শে মার্চ, ১৮৩৬।

প্রথম থেকেই লাইব্রেরি ইংরেজ ও ভারতীয় নাগরিকদের নিকট থেকে

সহযোগিতা লাভ করেছে। উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ সহযোগিতা লাভের সৌভাগ্য সেকালের আর কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়নি। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে কোনো-না-কোনো সময়ে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাধানাথ শিকদার, রসময় দত্ত, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শশীচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, টি, বি, মেকলে, জে, সি, মার্শম্যান, লর্ড মেটকাফ, জেমস্ প্রিন্সেপ, জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, এইচ, বিভারিজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ স্ট্রং-এর এসপ্লানেড রো-এর বাড়ীর একতলায় কয়েক বছর লাইব্রেরির কাজ চলবার পর প্রশস্ততর জায়গার প্রয়োজন দেখা দিল। সুতরাং ১৮৪১ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভবনের একাংশে। কিন্তু এখানেও স্থায়ী ভাবে থাকা চলবে না। সুতরাং স্থায়ী ঠিকানার জন্য পরিচালক সভা তৎপর হলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে লর্ড মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কলকাতার নাগরিকরা একটি ভবন নির্মাণ করে সেখানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির মতো প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মেটকাফ হল কমিটি আর একটি নতুন লাইব্রেরি স্থাপনের সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। তাঁরা কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরিকেই আহ্বান জানালেন মেটকাফ হলে আসতে। অবশ্য এর জন্য পাবলিক লাইব্রেরিকে ভবন নির্মাণের ব্যয় আংশিকরূপে বহন করতে হবে। প্রায় ১৬,৪০০ টাকা দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরি মেটকাফ হলের দোতলা ব্যবহারের অধিকার পায়। একতলায় হল এগ্রি-হর্টিকালচারেল সোসাইটির আপিস। মেটকাফ হলের জমি পাওয়া গিয়েছিল বাংলা সরকারের কাছ থেকে দান হিসাবে। বার্ন কোম্পানী ৬৮,০০০ টাকা ব্যয় করে ভবনটি নির্মাণ করেছিল। পাবলিক লাইব্রেরি এবং এগ্রি-হর্টিকালচারেল সোসাইটী মোট ব্যয়ের একাংশ বহন করেছে; বাকী টাকা এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি তার স্থায়ী গৃহ মেটকাফ হলে উঠে আসে।

প্রশস্ত জায়গা পেয়ে লাইব্রেরির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেল। মিঃ স্ট্যাসি পদত্যাগ করায় প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে কলকাতার লেখক ও গবেষকদের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মেটকাফ হল।

পদাধিকার বলে প্যারীচাঁদ ছিলেন পরিচালক সমিতির সম্পাদক। তিনজন কিউরেটার নিয়ে এই কমিটি গঠিত হত। সাধারণ কমিটি ব্যতীত ছিল দু'টি উপ-সমিতি। একটি হাউস কমিটি অন্যটি সিলেকশান কমিটি। হাউস কমিটির উপর দায়িত্ব ছিল লাইব্রেরির গৃহ এবং অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের; সিলেকশান কমিটি বই ও পত্রিকা নির্বাচন করতেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনজন কিউরেটার নিয়ে গঠিত কমিটির পরিবর্তে একটি লাইব্রেরি কাউন্সিল গঠন করা হয়। কিউ-রেটার নির্বাচিত করা হত অংশীদারদের মধ্য থেকে; সাধারণ সভ্যদের নির্বাচনের অধিকার ছিল না। কিন্তু সম্প্রসারিত নতুন কাউন্সিলে অংশীদার এবং সাধারণ সভ্যদের নির্ধারিত হারে আসন দেওয়া হল। কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ,—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

লাইব্রেরির আয়ের পথ ছিল প্রধানত দু'টি: অংশ বিক্রয় এবং সভ্যদের মাসিক চাঁদা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে দানও পাওয়া যেত। ১৮৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরির মোট আয় হয়েছিল ১৩,৯৮৬ টাকা; ব্যয়ের অঙ্ক ছিল ৮,৬৩১ টাকা। বই কেনার জন্য ব্যয় হয়েছে ৬৫০ টাকা; আর পত্রিকা কেনা হয়েছিল ৫১২ টাকার। কর্মীদের বেতনের জন্য ঐ বছর ব্যয় হয়েছে ২,৭১০ টাকা। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং আয়ও বাড়ল। ঐ বছর লাইব্রেরি বই কিনেছে ৫,০১৮ টাকার এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের বাজেট ছিল ৩৫৫ টাকার। কর্মীদের বেতনের জন্য ব্যয় হয়েছে ৫,৪৬৯ টাকা। দশ বছর পরের হিসাব থেকে দেখা যায় আয়ের অঙ্ক ক্রমশ কমে আসছে। এই সঙ্কট এড়াবার উপায় নির্ধারণের জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উপ-সমিতির উপর ভার দেওয়া হয়। উপ-সমিতি বই ও পত্রিকার ব্যয় না কমিয়ে অন্য সব ব্যয় হ্রাস করবার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু সুপারিশ অনুসারে কাজ করেও আর্থিক অবস্থার অবনতি ঠেকানো যায়নি।

লাইব্রেরির উন্নতি এবং সুব্যবস্থা নির্ভর করে প্রধানত কর্মীদের উপর। কর্মীদের সংখ্যা বেশী ছিল না এবং বেতনও ছিল সাধারণ। তথাপি তাদের আন্তরিক সেবার জন্যই লাইব্রেরি সকল দিক থেকে সাফল্য লাভ করেছিল। লাইব্রেরি কাজ আরম্ভ করেছিল নিম্নলিখিত কর্মী নিয়ে:—

| | | |
|---|---|---|
| গ্রন্থাগারিক | ( অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ) | মাসিক বেতন ২০০ টাকা |
| ১ সহ-গ্রন্থাগারিক | ( হিন্দু ) | ” ” ৫০ ” |
| ১ সরকার | | ” ” ১৬ ” |

| | |
|---|---|
| ২ দপ্তরী | মাসিক বেতন ১২ টাকা |
| ১ বেয়ারা | ,, ,, ৫ ,, |
| ১ পিয়ন | ,, ,, ৫ ,, |
| ১ দারোয়ান | ,, ,, ৫ ,, |

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরির কাজ অনেক বেড়েছে ; কর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বেতন বাবদ ব্যয় কমেছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্ট্যাসি যতদিন গ্রন্থাগারিক ছিলেন ততদিন বেতন বাবদ ব্যয় হত ৩৪৩ টাকা; প্যারীচাঁদ মিত্রের আমল থেকে এই টাকার পরিমাণ ( কর্মীর সংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও ) হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল প্রায় ৩১৬ টাকা। স্ট্যাসি পেতেন দু'শ' টাকা ; প্যারীচাঁদের বেতন হল ১২০ টাকা। চারজন সহকারী গ্রন্থাগারিকের বেতন ৩৬ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে। ক্যাশিয়ার ১৪, চারজন সরকার ৬, দপ্তরী ৮, দু'জন দারোয়ান ৯, তিনজন হরকরা ৫॥০, ফরাস ৫॥০, তিন জন পাখাওয়ালা ৪ টাকা করে পেত।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ জন এবং এদের জন্য বার্ষিক ব্যয় হত ৪,২২৪ টাকা।

কাজের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা কম ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়বার ঘরটি খোলা থাকত। লেণ্ডিং সেকশান খোলা থাকত সকাল ন'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত। রবিবার এবং নিম্নলিখিত ছুটির দিনে লাইব্রেরি বন্ধ থাকত :

| | |
|---|---|
| পয়লা জানুয়ারি | ১ |
| সরস্বতী পূজা | ১ |
| রাণীর জন্মদিন | ১ |
| গুড ফ্রাই-ডে | ১ |
| দুর্গা পূজা | ৫ |
| যীশুর জন্মদিন | ১ |
| মোট | ১০ দিন |

অংশীদার এবং সভ্য ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রদের বিনা চাঁদায় লাইব্রেরিতে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হত। ১৮৪৭ সালে সভ্য সংখ্যা ( চাঁদাদাতা ) ছিল ২০৩ ; ১৮৭২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৭। সভ্য সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে,—৩৯০। ১৮৪৭ সালে সভ্যরা গড়ে ৯৮ খানি

বই পড়েছেন ; ১৮৭২ সালে সভ্য সংখ্যা হ্রাস পেলেও মাথাপিছু পুস্তক ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০। কলকাতার নাগরিকদের যে বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে তা এই থেকে প্রমাণিত হয়।

পাঠকরা কি ধরনের বই পড়ত তারও কিছু ধারণা লাইব্রেরির বার্ষিক কার্য-বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। নীচে কয়েক বছরের হিসাব দেওয়া হল :

| বছর | ব্যবহৃত বইয়ের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | উপন্যাস | অন্যান্য বই | সাময়িক পত্র |
| ১৮৪৭ | ১০,৪৩৬ | ৫,১৩২ | ৪,১৯৭ |
| ১৮৫২ | ১৩,৬৯৭ | ৯,১৩০ | ৫,০৩৭ |
| ১৮৬৫ | ১০,৩৮৭ | ৭,২৪৯ | ৮,৭৫১ |
| ১৮৭২ | ১০,৩১৩ | ৫,৯৮৮ | ১০,৩৭৯ |

পুস্তকের ব্যবহার পুস্তক নির্বাচনের নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ, যে গ্রন্থাগারে যে ধরনের বই বেশী সংগ্রহ করা হবে সেই শ্রেণীর বই-ই বেশী ব্যবহৃত হবে। কোনো বিষয়ের বই যদি লাইব্রেরিতে না থাকে তাহলে সে বিষয়ের বই সম্বন্ধে পাঠকদের আগ্রহের পরিমাণ বিচার করা যায় না। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ সকল বিষয়ের বই সংগ্রহ করবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পাঠকদের চাহিদা মিটাবার জন্য উপন্যাসকে তাঁরা প্রাধান্য দেননি। কিনেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বই। পাঠকদের রুচি এবং চিন্তার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এমন অনেক বই সংগ্রহ করা হত যাদের জন্য পাঠক মহলে চাহিদা দেখা দেয়নি।

পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি উপ-সমিতি ছিল। নানা স্থত্র থেকে কমিটির সভ্যরা বিশেষ খোঁজ খবর নিয়ে বই কিনতেন। পুস্তক পরিচয়, প্রকাশকের তালিকা ইত্যাদি তো ছিলই ; এ ছাড়া সভ্যরা কলকাতার বইয়ের দোকান থেকে দেখবার জন্য যে-সব বই পাঠাত তা-ও বিশেষ যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করতেন।

পাবলিক লাইব্রেরিতে উপন্যাসের চাহিদা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে এই চাহিদাকে প্রাধান্য দেননি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত হিসাব থেকে। কোন বিষয়ের কত বই কেনা হয়েছে সে সম্বন্ধে কয়েক বছরের হিসাব দেওয়া হল :

| বছর | ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও জীবিকার্জন সম্বন্ধীয় বই | ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ, ভারত সম্বন্ধীয় | উপন্যাস ও কবিতা |
|---|---|---|---|
| ১৮৫৮ | ৭৩ | ১৭৫ | ১৩০ |
| ১৮৬৩ | ১০২ | ১৩৩ | ১২৬ |
| ১৮৬৮ | ১০৭ | ২৬৬ | ১৫৪ |
| ১৮৭২ | ৯০ | ১৫১ | ১০১ |

অন্যান্য শ্রেণীর বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা হল না। ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত ছাড়া হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষার বইও সংগ্রহ করা হত। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তামিল ও তেলেগু বই সংগ্রহ করে দেবার জন্য মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে সংগ্রহ নীতির এরূপ উদারতা প্রকৃতই দুর্লভ। অংশীদারদের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতার জন্যই সকল দেশের সকল ভাষার উল্লেখযোগ্য বই সংগ্রহের আগ্রহ দেখা যায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী অংশীদার কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন যে, বিদেশের বিদ্বজ্জন সভার প্রকাশনগুলি পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহ করা কর্তব্য। কারণ, "One of the objects of the formation of this Institution is the dissemination of European literature and Science in this country." বিদেশী প্রকাশন ( বিদ্বজ্জন সভার ) সংগ্রহের জন্য তাঁরা প্রস্তাব করেন যে পাবলিক লাইব্রেরির মুদ্রিত বার্ষিক কার্যবিবরণী, পুস্তক তালিকা প্রভৃতি বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হোক। পাবলিক লাইব্রেরি এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় গ্রন্থসম্পদ বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সুষ্ঠু সংগ্রহনীতির ফলে আমরা বহু দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান পুস্তকের উত্তরাধিকারী হয়েছি।

ভালো বই সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। বই সুষ্ঠুরূপে সাজিয়ে না রাখলে যথার্থ ব্যবহার ব্যাহত হয়। পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ পুস্তক বিন্যাস ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রথম কয়েক বছর পাঠক যে কোনো বই নিজেই নিয়ে পড়তে পারত। কিছুকাল পরে দেখা গেল অনেক

পুথিপত্র অদৃশ্য হয়েছে। বেথুন সাহেব পরিচালক সভায় যোগ দেবার পর প্রস্তাব করলেন যে, পাঠকদের পুস্তকমঞ্চের নিকট যেতে দেওয়া হবে না। লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি শহরের বড় বড় লাইব্রেরিতে যেমন চাহিদাপত্র বা রিকুইজিসান স্লিপ পেলে পাঠকদের বই দেওয়া হয় এখানেও সেই রীতি অবলম্বন করতে হবে। বেথুনের পরিকল্পিত চাহিদাপত্রে তারিখ, বইয়ের নম্বর, বইয়ের নাম এবং পাঠকের স্বাক্ষর থাকত। আনুষ্ঠানিকরূপে রিকুইজিসান স্লিপের ব্যবহার এ দেশে এই বোধ হয় প্রথম। বেথুন সাহেবের পরামর্শে মঞ্চের উপর স্থির-বিন্যাস রীতিতে ( fixed location system ) বই সাজাবার ব্যবস্থাও করা হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তক বর্গীকরণের উদ্দেশ্যে ২৮টি প্রধান বিষয়-বিভাগের প্রবত ন করা হয়। এছাড়া অনেকগুলি উপবিভাগও ছিল। পাবলিক লাইব্রেরি তিনটি ক্যাটালগ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিল। সর্বশেষ ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে। ক্যাটালগের একটি পাণ্ডুলিপি থাকত লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে ; নতুন বইয়ের খবর পাঠকরা এই ক্যাটালগ থেকে পেত। এ ছাড়া নতুন বইয়ের মাসিক তালিকা 'ইংলিশম্যান' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশ করত। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ক্যাটালগের মতো উন্নত ধরনের গ্রন্থতালিকা সে সময় অন্য কোনো ভারতীয় গ্রন্থালয় সঙ্কলন করেনি।

পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির একক অস্তিত্বের গৌরব অস্তমিত হয়ে এলো। তাছাড়া ইংরেজ সম্প্রদায় ক্রমশ তাদের সহযোগিতা গুটিয়ে আনল। এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক। প্রথম দিকে ভারতীয় ও ইংরেজ সভ্যরা মিলেমিশে হৃদ্যতার সঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর থেকে ধীরে ধীরে ইংরেজরা দূরে সরে যেতে লাগল। নীল আন্দোলন, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের রাজনৈতিক চেতনা বিভেদ বৃদ্ধির সহায়তা করেছে। ইংরেজরা নিজেদের জন্য পৃথক ক্লাব, লাইব্রেরি ইত্যাদি গড়ে তুলল। এই সব কারণে ১৮৮৫ সালে পাবলিক লাইব্রেরির আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল যে কর্তৃপক্ষ সাহায্যের জন্য বাংলা সরকারের নিকট আবেদন জানাতে বাধ্য হলেন। সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল এই সর্তে যে গ্রন্থাগারটিকে ফ্রী পাবলিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করতে হবে। পরিচালকবর্গ এই সর্ত স্বীকার করবার পর কিন্তু সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল না। যাই হোক ১৮৯০

খ্রীষ্টাব্দে কর্পোরেশন লাইব্রেরি পরিচালনার ব্যয় বহন করতে রাজী হল এর পরিচালনায় প্রতিনিধিত্বের সর্তে। কর্পোরেশনের সাহায্য পেয়ে লাইব্রেরি পুনর্গঠনের আয়োজন হল এবং প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে ১৮৯০ সালের অগাস্ট মাসে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়। বিপিনচন্দ্র মাত্র দু'বছর এখানে কাজ করেছেন এবং এরই মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক বিভারিজ সাহেবের পরামর্শ অনুসারে আভিধানিক গ্রন্থতালিকা (Dictionary Catalogue) প্রণয়ন আরম্ভ করেছিলেন।

উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে এই ভরসায় পাবলিক লাইব্রেরির দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে কাজের চাপ বাড়ল, চাঁদা থেকে যে আয় হত তা বন্ধ হল; অথচ প্রতিশ্রুত সাহায্য গভর্ণমেণ্ট বা কর্পোরেশন থেকে এল না। সুতরাং অনেক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুমূর্ষু প্রতিষ্ঠানটির প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব হল না।

ভারতবর্ষের রাজধানীতে একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন মেটকাফ হলে গিয়ে দেখলেন যে লাইব্রেরির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। উপন্যাস কিংবা সংবাদপত্র পড়তে অল্প কয়েকজন পাঠক তখনো আসত। এই পাঠকদের দলবদ্ধ পায়রার উৎপাতে নিশ্চিন্ত মনে পড়া অসম্ভব ছিল। অযত্নরক্ষিত পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক মূল্যবান বই দেখে কার্জন মুগ্ধ হলেন। তাঁর উদ্যোগের ফলে ভারত সরকার প্রত্যেক অংশীদারকে নগদ পাঁচশ' টাকা দিয়ে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির স্বত্ব কিনে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত তদানীন্তন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করে দেন। দুই লাইব্রেরি এক হয়ে নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি গড়ে উঠল এবং তা প্রতিষ্ঠিত হল মেটকাফ হলে। ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি লর্ড কার্জন এই নবগঠিত ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। যে-সব সর্তে গভর্ণমেণ্ট কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ক্রয় করেন তা আইনানুগ করবার জন্য ১৯০২ সালে Imperial Library ( Indentures Validation ) Act বিধিবদ্ধ হয়।

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ইতিহাস বিশদরূপে পাওয়া যাবে এর বার্ষিক কার্যবিবরণীতে। গ্রন্থাগার পরিচালনার সকল সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যবিবরণীর সংখ্যাগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। এমন সুন্দর রিপোর্ট ঊনবিংশ শতকের আর কোন ভারতীয় গ্রন্থাগারই সঙ্কলন করেনি।

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি সংস্কৃতিবান নাগরিকদের মিলনকেন্দ্র হবে,—উদ্যোক্তাদের এই আদর্শ সফল হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিন্তাধারা প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা ও ইতিহাসের নতুন তত্ত্বগুলি কলকাতার জনসাধারণ পেয়েছে পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থরাজি থেকে। কলকাতার সকল বিশিষ্ট নাগরিকই এই লাইব্রেরির সঙ্গে কোনো না কোনো সময়ে যুক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রকে কেন্দ্র করে মেটকাফ হলে যে বৈঠক বসত তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর প্রেরণায় ১৮৬৭ সালে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা করবার জন্য 'সমাজবিজ্ঞান সভা' স্থাপিত হয়। এই সভার বৈঠক বসত মেটকাফ হলে।

গ্রন্থাগারের সাফল্যের জন্য যে ঔদার্যের প্রয়োজন পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। তাঁরা শুধু লাইব্রেরির দ্বার সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি ; লাইব্রেরির পাঠাগারে বসে যে কোন লোক যে কোন পুথিপত্র বিনা চাঁদায় পড়বার সুযোগ পেত। লাইব্রেরির অংশীদার কিংবা চাঁদাদাতারা এর জন্য কখনো আপত্তি করেননি।

শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরেও কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির একটি বড় দান আছে। লাইব্রেরিটি সরকারের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান নয় বলে টাকা পয়সা লেন-দেনের ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধা হত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভা লাইব্রেরি আইনানুযায়ী যাতে সরকারের অনুমোদন লাভ করে তার জন্য আবেদন জানালেন। এই সভার ঐকান্তিক ও দীর্ঘকালের চেষ্টার ফলে ১৮৬০ সালের ২১নং আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের দ্বারা সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভা এবং সমাজকল্যাণ সমিতিগুলি রেজিস্ট্রেশানের ব্যবস্থা হয়েছে।

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সব চেয়ে বড় দান স্বভাবতই বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও প্রসারের মধ্যে। প্রথম সফল গ্রন্থাগার হিসাবে পাবলিক লাইব্রেরি পরবর্তী গ্রন্থাগারগুলির আদর্শ ছিল। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রেরণা যুগিয়েছে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি। পাবলিক লাইব্রেরি মফঃস্বলের সভ্যদের নিকট পোস্টাফিসের মারফৎ বই পাঠাত। যে-সব জায়গায় বই যেত সেখানে পুথিপত্র সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে ওঠবার ফলে কিছু দিন পরে গ্রন্থাগার স্থাপিত হত। এই সব নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে

পাবলিক লাইব্রেরি উৎসাহ, উপদেশ এবং অতিরিক্ত ও বাতিল বই দিয়ে সাহায্য করত।

আজ যাঁরা এদেশে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে গেছেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। লাইব্রেরি কাউন্সিল ঐ বছর সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে, কর্পোরেশনের পরিচালনায় গ্রন্থাগারটি ফ্রী পাবলিক লাইব্রেরি হোক। ব্যয় নির্বাহের জন্য ইচ্ছা করলে টাকা প্রতি এক পাই লাইব্রেরি-কর ধার্য করা যেতে পারে। তারপর পঁচাত্তর বছর পার হয়ে গেছে; কলকাতা নগরীতে এখনো নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

## গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র

রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্য পরিচয় ঢেকে রেখেছে। বিপিনচন্দ্র যে কিছুকাল গ্রন্থাগারিকের কাজ করেছেন সে কথা কম লোকেই জানেন।

১৮৯০ সালের অগাস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন নানা কারণে লাইব্রেরির পূর্ব গৌরব ম্লান হয়ে এসেছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে এই গ্রন্থাগার কলকাতার শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের নিকট থেকেও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে নগরীর সাংস্কৃতিক জীবনে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সময় যে-সব ইংরেজ উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই ভারত ত্যাগ করেছেন। বাঙালী অংশীদাররাও বোধ হয় কেউ আর জীবিত ছিলেন না। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কম লোকেরই বিদ্যাচর্চার আগ্রহ ছিল। সুতরাং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গ্রন্থাগারের তখন মুমূর্ষু অবস্থা।

এই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে না রাখলে নগরীর সাংস্কৃতিক জীবনের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেল। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিও নিয়মিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল একটি সর্তে। সেই সর্তটি এই যে, গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একটি কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের মোট বারোজন সভ্যের মধ্যে ছয়জন নির্বাচন করবে মিউনিসিপ্যালিটি ; ছয় জন থাকবে অংশীদারদের প্রতিনিধি। লাইব্রেরিয়ান হবেন কাউন্সিলের সেক্রেটারী।

১৮৯০ সালের ২০শে এপ্রিল কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাব অনুযায়ী নবগঠিত কাউন্সিলের পরিচালনাধীনে আসে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ লী হলেন কাউন্সিলের সভাপতি। মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক বিভারিজ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, প্রভৃতি।

তখন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এম, গ্রেগরি। গ্রন্থাগারের নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার মতো উদ্যম ও কর্মক্ষমতা তাঁর ছিল না। কাউন্সিল তাঁকে গ্র্যাচুইটি দিয়ে চাকরি থেকে বিদায় দিলেন। লাইব্রেরি বাঁচাতে হলে কর্মক্ষম উদ্যমশীল উপযুক্ত ব্যক্তি আনতে হবে। লাইব্রেরিয়ানের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। পদের বেতনক্রম ১০০৲-১০৲-২০০৲ টাকা। সে যুগে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই বেতন লোভনীয় ছিল। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থ-সম্পদের অবাধ ব্যবহারের সুযোগও ছিল আর একটি বড় আকর্ষণ। সুতরাং সত্তর বছর পূর্বেও একটি পদের জন্য প্রায় ২২০টি আবেদনপত্র পাওয়া গেল।

১৮৮৯ সালে বিপিনচন্দ্র লাহোর 'ট্রিবিউনের' দেড় শ' টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে কলকাতা ফিরে এসেছেন। ১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বিপিনচন্দ্র আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে চাকরির সন্ধান করছিলেন। পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদ তাঁকে আকৃষ্ট করল। তিনি আবেদন করলেন। আবেদনের সমর্থনে বিপিনচন্দ্রের কোনো প্রশংসাপত্র ছিল না। প্রশংসাপত্রের পরিবর্তে তিনি তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার মুদ্রিত কপি কাউন্সিলের সভ্যদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি প্রত্যেক সভ্যকে জানিয়ে দিলেন যে আহ্বান করলে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। একমাত্র কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ লী বিপিনচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

প্রায় ২২০ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে ৬ জনকে নির্বাচিত করে ১৮ই অগাস্ট (১৮৯০) সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। বিপিনচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য মনোনীত হন। অবশ্য হাইকোর্টের উকিল এবং কাউন্সিলে অংশীদার-দের প্রতিনিধি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই বিপিনচন্দ্র পাল কে? অন্যান্য প্রার্থীদের মতো তিনি তো আমাদের বাড়িতে দেখা করতে যাননি!" তার উত্তরে বিভারিজ বলেছিলেন, "বিজ্ঞাপন বের হবার পর থেকে তদ্বিরের জ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্র যে বাড়ি গিয়ে আমাদের বিরক্ত করেননি সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

১৮৯০ সালের ২০শে অগাস্ট বিপিনচন্দ্র কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক এবং লাইব্রেরি কাউন্সিলের সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগদান করেন।

কাজে যোগ দিয়েই বিপিনচন্দ্র স্বেচ্ছায় একটি দায়িত্বের ভার গ্রহণ করলেন। লাইব্রেরি কাউন্সিলের গ্রন্থাগার পুনর্গঠন পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল

নতুন পদ্ধতিতে ক্যাটালগ সঙ্কলন করা। শুধু এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য অতিরিক্ত লোক নেবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র বললেন, নতুন পদ্ধতিতে তিনিই লাইব্রেরির বই ক্যাটালগ করবেন ; নতুন লোক নিযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই। বিভারিজ সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী বিপিনচন্দ্র কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন পদ্ধতিতে ক্যাটালগ সম্পূর্ণ করেন। পূর্বে বইগুলি প্রায় কুড়িটি বিষয় অনুসারে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক লেখক সূচী করা হত। কোন্ বই কোন্ বিভাগের অন্তর্গত তা জানা না থাকলে, অথবা সঠিকরূপে অনুমান করতে না পারলে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বই খুঁজে পাওয়া এক সমস্যা ছিল। বিপিনচন্দ্র বিষয়-বিভাগের সংখ্যা খুব কমিয়ে এবং প্রচুর পরিমাণে ক্রস-রেফারেন্স ব্যবহার করে পাঠকদের সহজে প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পাবার সুযোগ করে দিলেন।

সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি নিঃশুল্ক রীডিং রুম খোলবার সর্তে মিউনিসিপ্যালিটি আর্থিক সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছিল। সুতরাং বিপিনচন্দ্রকে এই রীডিং রুম জনপ্রিয় করবার দায়িত্বও নিতে হয়েছিল। তাঁর চেষ্টা যে সফল হয়েছিল তা সমসাময়িক পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে রীডিং রুমে গড়ে ২১ জন পাঠক প্রতিদিন আসত ; পর বৎসর মার্চ মাসে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল আশির কোঠায়। মেটকাফ হলের এই রীডিং রুম সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকত। আর লেনডিং বিভাগ খোলা থাকত বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

বিপিনচন্দ্র আগ্রহ সহকারে কাজ শুরু করলেও বেশী দিন শান্তিতে থাকতে পারলেন না। তার প্রধান কারণ এই যে, কাউন্সিলের বারোজন সভ্যই নিজেকে গ্রন্থাগারিকের প্রভু বলে মনে করতেন। বিপিনচন্দ্র যা কর্তব্য মনে করতেন সেই কাজ করে যেতেন। সবাইকে সন্তুষ্ট করবার মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। সুতরাং শীগ্গিরই বিরোধ দেখা দিল। বর্তমানেও যাঁরা কোনো কমিটির অধীনে কাজ করেন তাঁদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রথম সংঘাত দেখা দিল বিপিনচন্দ্রের উপস্থিতির সময় নিয়ে। সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত রীডিং রুম খোলা থাকত বলে বিপিনচন্দ্র কোনো নির্দিষ্ট সময়ে লাইব্রেরিতে আসতেন না। কখনো সকালে, কখনো দুপুরে আসতেন। গ্রন্থাগারের কাজ কি রকম চলছে তা দেখাবার জন্য এক এক দিন এক এক সময়ে আসা তাঁর নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু কাউন্সিলের একজন সভ্য

বিপিনচন্দ্রের উপস্থিতির নির্দিষ্ট সময় নেই দেখে হাজিরা খাতায় অপমানজনক মন্তব্য করে যান। বিপিনচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে সেই সভ্যকে জানিয়ে দিলেন যে, লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তিনি যেন সে বিষয়ে কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; আফিসে প্রবেশ করে এরূপ অভদ্র মন্তব্য করলে লাইব্রেরিয়ান তাঁকে বের করে দিতে বাধ্য হবেন। বিপিনচন্দ্রের এই প্রতিবাদ কাউন্সিলের কোনো কোনো সভ্য অপমানকর বলে মনে করলেন। তার উপর অডিট রিপোর্টে বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ থাকায় অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠল।

অডিট রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি প্রধান অভিযোগ ছিল। একটি হল এই যে, অনুমোদিত নিয়ম লঙ্ঘন করে লাইব্রেরির অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আর একটি এই যে, বিপিনচন্দ্র অন্যায়ভাবে নিজের জন্য লাইব্রেরির অর্থ ব্যয় করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি বাড়ি থেকে লাইব্রেরিতে আসবার জন্য গাড়ি ভাড়া নিয়েছেন ; এবং নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লাইব্রেরির অর্থে আরাম কেদারা কিনেছেন। রিপোর্টের সিদ্ধান্ত এই : Babu Bepin Chandra Pal has altogether been failing in his duties as secretary......

বিপিনচন্দ্র একাধারে পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। সম্পাদক হিসাবে তাঁকে লাইব্রেরির আফিস পরিচালনা করতে হত। এই কাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি বলে রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কখনো প্রশ্ন ওঠেনি।

বিপিনচন্দ্র অডিট রিপোর্টে উত্থাপিত অভিযোগের যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন। অনভিজ্ঞতার জন্য যে কিছু ভুল করেছেন একথা স্বীকার করতে তিনি দ্বিধা করেননি। যাই হোক, ক্রমশ এই পরিবেশে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করায় বিপিনচন্দ্র পদত্যাগ করেন। লাইব্রেরি কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ লী কিছুদিন পরে বিপিনচন্দ্রকে মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স ইনস্পেক্টরের চাকরি দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সত্য হলে লী তাঁকে এই চাকরি দিতেন না।

বিপিনচন্দ্র মাত্র বছর দেড়েক কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গগনচন্দ্র হোম তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে লিখেছেন : "সুহৃদ্বর বিপিনচন্দ্র যখন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির—এখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি—

সম্পাদক, তখন আমি সিটি কলেজ ছাড়িয়া তাঁহার সহকারীর কার্য গ্রহণ করি। আমার এই কাজ লইবার প্রধান প্রলোভন ছিল অধ্যয়নের সুযোগ। যে কয় বৎসর পাবলিক লাইব্রেরির কাজে ছিলাম, সে কয় বৎসর প্রাণ ভরিয়া নানা বিষয়ে পড়িয়া লইয়াছিলাম। আমার এ জ্ঞানচর্চায় সঙ্গী ও উৎসাহদাতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র। লাইব্রেরিতে কোন নূতন বই আসিলেই তিনি নিজে তাহা না পড়িয়া ও আমাকে না পড়াইয়া ছাড়িতেন না।"

বিপিনচন্দ্রের পরে রাধারমণ মিত্র গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কিন্তু কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থার উন্নতি হল না। ১৯০২ সালে ভারত সরকার অংশীদারদের টাকা দিয়ে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ক্রয় করেন এবং পর বৎসর নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির দ্বার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি ছিল সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য বিভাগীয় গ্রন্থাগার। নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিপিনচন্দ্র "নিউ ইণ্ডিয়ায়" (জুন ২, ১৯০২) যে মন্তব্য করেছিলেন নিম্নে তার মর্মানুবাদ দেওয়া হল :

"প্রত্যেক সভ্য দেশে পাবলিক স্কুল, পলিটেকনিক, মিউজিয়াম ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। ভারত সরকার এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন দেখে আমরা আনন্দিত। অনেক দেশে—বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—রাজ্য সরকার অথবা মিউনিসিপ্যালিটি শুধু যে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়বার সুযোগ দেয় তাই নয়; অবসর সময়ে পড়বার জন্য নাগরিকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বই বাড়িতেও নিতে দেওয়া হয়। এর জন্য চাঁদা দিতে হয় না। বোস্টন শহরে যদি এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে তাহলে কলকাতায় তার প্রয়োজন আরো বেশী। সেখানে এমন অনেক লোক আছে যারা অবসর ভোগ করে; এমন নরনারী আছে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চাই যাদের জীবিকার্জনের পথ। তাদের পক্ষে লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের তেমন সুযোগ নেই। জীবিকার্জনের জন্য তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কাজের ফাঁকে হয়ত আধঘণ্টা পড়বার সুযোগ হতে পারে। সুতরাং বই বাড়ি এনে পড়বার সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। আমরা জানি কলকাতা লণ্ডন নয় এবং মেটকাফ হলের লাইব্রেরিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তথাপি একথা বলা চলে যে, এই গ্রন্থাগারকে কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সহায় এবং যথার্থ

কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উৎসুক হন তাহলে সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পাঠকদের বই পড়বার সুযোগ দিতে হবে এবং বিনা চাঁদায় বাড়িতে বই নেবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।"

বিপিনচন্দ্রের আদর্শানুযায়ী নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার কলকাতায় আজও স্থাপিত হয়নি।

# কোষগ্রন্থের কথা

কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আজকের নয়। অনেক বই পড়বার পরিশ্রম বাঁচিয়ে প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে কোন বিষয়ের উপর সকল তথ্যের সারমর্ম কি করে পাওয়া যেতে পারে, তার জন্য পরীক্ষা চলছে বহু শতাব্দী যাবৎ। কোষগ্রন্থ বলতে এখন আমরা যা বুঝি, সেই শ্রেণীর বইয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধ হয় Historia Naturalis; প্লিনি ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এ বই সঙ্কলন করেছিলেন। চারশ' লেখকের দু' হাজার বই থেকে প্রায় কুড়ি হাজার নির্বাচিত উধৃতি সঙ্কলন করেছিলেন প্লিনি। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের কৃতিত্ব চীনের। দশম শতাব্দীতে সঙ্কলিত চীনা কোষগ্রন্থ 'তাই পিং য়ু তান'-কে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া হয়।

ছাপাখানার প্রসারের পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল। এসব বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা পাঠকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাছাড়া কলকারখানার যুগে সময়ের মূল্য বেড়েছে। কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত পাওয়া চাই। বই খুঁজে খুঁজে বের করবার সময় নেই। কালের এই দাবি মেটাবার জন্য আজকাল এত বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স বই বেরিয়েছে। যে-সব কোষগ্রন্থে সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর পাওয়া যায় রেফারেন্স বই হিসাবে তাদের মূল্য সবচেয়ে বেশী।

একালের পাঠকের পক্ষে তিনটি রেফারেন্স বই বিশেষ প্রয়োজনীয়: এনসাইক্লোপিডিয়া বা কোষগ্রন্থ; অভিধান ও মানচিত্র। আজকাল বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যেকার সীমারেখা শিথিল হয়ে পড়েছে। কবি বা ঔপন্যাসিকও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। হাতের কাছে একটি কোষগ্রন্থ না থাকলে অপরিচিত তথ্যের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

তাছাড়া আজকাল বিদেশে কোষগ্রন্থ শিক্ষার জগতে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। জনসাধারণের যে বৃহৎ অংশ স্কুলে-কলেজে পড়বার সুযোগ পায়নি একটি সত্যিকার ভালো কোষগ্রন্থ তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভের যোগ্য। আজকাল তাই কোষগ্রন্থের আদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নবম সংস্করণ পর্যন্ত সঙ্কলকদের মনে ধারণা ছিল কোষগ্রন্থ বিশেষজ্ঞ

এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু তার পর থেকে কোষগ্রন্থকে বৃহত্তমসংখ্যক পাঠকের উপযোগী করবার দিকে সঙ্কলকরা দৃষ্টি দিয়েছেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া বা কোষগ্রন্থের একটি সংজ্ঞা হল : 'a systematic summary of all the information significant to mankind.'

নিছক শব্দার্থ, যা অভিধানে পওয়া যায় এবং যে শব্দের বিস্তৃততর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই অথবা সম্ভব নয়, তা কোষগ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক য়ুরোপীয় কোষগ্রন্থে অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে। কারণ তখনো অভিধান ও কোষগ্রন্থের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়নি। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণে ( ১৭৬৮ ) অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে। যেমন—India—Mogul Empire ; Woman—The Female of man.

আমাদের বিশ্বকোষেও নিছক শব্দার্থ অনেক জায়গা জুড়ে আছে।

"সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট" কথাটি লক্ষ্যণীয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশ হিসাবে প্রয়োজনের পার্থক্য ঘটে। বাঙলা ভাষার কোষগ্রন্থে যে তথ্য থাকা আবশ্যক ইংরেজীতে তার সবগুলি প্রয়োজনীয় নয়। এই জন্য পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা অনুসারে কোষগ্রন্থের পরিকল্পনা রচনা করা দরকার।

কোষগ্রন্থের কোন পরিকল্পনাই স্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে কোনো বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, কোনো বিষয়ের আকর্ষণ ক্রমশ হ্রাস পায়। কোষগ্রন্থ সঙ্কলককে এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বিভিন্ন সংস্করণ তুলনা করে পড়লে দেখা যাবে সময়ের সঙ্গে কিভাবে এর রূপ বদল হয়েছে। ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণে ( ১৭৬৮ ) অ্যাটমের উপরে আছে মাত্র চারটি বাক্য ; আর প্রেমের উপরে আছে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ। বর্তমান সংস্করণে অ্যাটম পেয়েছে সাড়ে দশ পাতা ; প্রেমের উপরে কোন পৃথক প্রবন্ধই নেই। ব্রিটানিকার সম্পাদক অভিযোগ পেলেন পাঠকের কাছ থেকে : সম্পাদক কি সংসারে প্রেমের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন? সম্পাদক জবাব দিলেন, নবম সংস্করণ থেকে প্রেমের উপরে প্রবন্ধটি বাদ দেওয়া হয়েছে ; কারণ, 'Love is better experienced than read about ; the opposite is true of the atomic bomb."

কোষগ্রন্থ নানাশ্রেণীর হতে পারে। আমরা এখানে সেই জাতীয় কোষগ্রন্থের

কথাই বিশেষ করে বলছি যেখানে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর তথ্য পরিবেশন করা হয়। এ ছাড়া বিশেষ-বিষয়ক কোষগ্রন্থের অভাব নেই। "এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস্", "এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোসাল সায়েন্সেস" ইত্যাদি রেফারেন্স বইয়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

কোষগ্রন্থ এক খণ্ডের হতে পারে; আবার পঁচিশ-ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হতে পারে। এক খণ্ডের ছোট কোষগ্রন্থের চাহিদা বিদেশের বাজারে খুব বেড়েছে। সাধারণ পাঠক সর্বদা ব্যবহারের জন্য ছোট কোষগ্রন্থই পছন্দ করে। বড় কোষগ্রন্থ কেনার সামর্থ্যও কম লোকেরই আছে। এক খণ্ডের কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে "কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া" শ্রেষ্ঠ।

কোষগ্রন্থ নানা মানের হতে পারে। "ব্রিটানিকা জুনিয়র" বা "অক্সফোর্ড জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া" কিশোর-কিশোরীদের জন্য সঙ্কলিত। সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের জন্য বহু কোষগ্রন্থ আছে। ব্রিটানিকা উচ্চতম মানের কোষগ্রন্থ।

আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে কোষগ্রন্থ মোটামুটি দুই শ্রেণীর। এক হল আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত করা; আর হল, প্রসঙ্গগুলির বিষয়ানুসারে সাজানো। এসরাজ, তবলা, বাঁশী, সেতার প্রথম শ্রেণীর কোষগ্রন্থে এ, ত, ব ও স অক্ষরের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাবে; এসরাজ ও সেতারের মধ্যে কয়েক শত পাতার ব্যবধান থাকবে। বাদ্যযন্ত্রগুলি যে পরস্পরের সহিত নানা দিক থেকে সম্পর্কান্বিত তা বোঝানো যায় না। কিন্তু যে কোষগ্রন্থে প্রসঙ্গগুলি বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত সেখানে বাদ্যযন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এরা পাশাপাশি থাকবে। এ জাতীয় বিন্যাসের সুবিধা এই যে, সম্পর্কান্বিত প্রসঙ্গগুলি সহ একটি বিষয়ের মোটামুটি ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।

অক্ষরানুসারে প্রসঙ্গ বিন্যাস করাই এখানকার প্রচলিত নীতি। এর সুবিধা এই যে, প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি দ্রুত বের করা যায়। ধারাবাহিক পাঠের জন্য কোষগ্রন্থ বা কোন রেফারেন্স বই রচিত হয় না। নতুন তেলেগু কোষগ্রন্থ বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত। অক্সফোর্ড জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়াও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই শ্রেণীর কোষগ্রন্থের পক্ষে বিস্তৃত নির্ঘণ্ট অপরিহার্য। অভিধানের মতো প্রসঙ্গগুলি যেখানে অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত, সেখানে—বিশেষ করে আকার ছোট হলে—নির্ঘণ্ট অনাবশ্যক। কিন্তু যদি বড় প্রবন্ধ থাকে তাহলে নির্ঘণ্ট প্রয়োজন। ব্রিটানিকায় এগ্রিকালচারের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে Agrarian Politics;

Reclamation ; Farming at Mid-20th century, World agriculture প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। ইনডেক্সে এই প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ না থাকলে পাঠকের পক্ষে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তাই ব্রিটানিকায় বিস্তৃত ইনডেক্স আছে। ব্রিটানিকার রিলেটিভ ইনডেক্স, নির্ঘণ্ট কত ভাল হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ব্রিটানিকায় ছোট বড় প্রায় চল্লিশ হাজার পৃথক প্রবন্ধ আছে। কিন্তু ইনডেক্সে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির এই বিস্তৃত বিশ্লেষণ ব্রিটানিকার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এডওয়ার্ড বালফুর সঙ্কলিত 'দি সাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়ায়" ভারতের উপরে প্রায় দুশ' পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। ভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে শুধু এই প্রবন্ধটির নির্ঘণ্ট প্রাসঙ্গিক খণ্ডটির শেষে দেওয়া হয়েছে।

কোষগ্রন্থের মূল্য বিচারের সময় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি যাচাই করে দেখতে হয়। (১) নির্ভরযোগ্যতা—সম্পাদক, লেখক, প্রকাশক প্রভৃতির পরিচয় নিতে হবে। কোন্ পরিকল্পনা অনুসারে সঙ্কলন করা হয়েছে, প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য কত ইত্যাদি ভালো করে দেখা দরকার; (২) পরিবেশিত তথ্য অধুনাতম এবং নির্ভুল কি না; (৩) প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জী আছে কি না; (৪) বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি কোন্ পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়েছে; (৫) ছবি, ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ইত্যাদি কোন্ শ্রেণীর।

বিষয়মূল্য ঘনিষ্ঠরূপে বিচার করবার জন্য অন্তত তিনটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পড়তে হবে। পাঠক যে বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানেন না সে বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন যে, বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়েছে কি না। যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে লেখাটি ভাল। আর একটি পড়তে হবে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। কোষগ্রন্থে আমরা নির্ভেজাল তথ্য আশা করি; লেখকের ব্যক্তিগত মতামত এখানে অবান্তর। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়কে বিচার করা যেতে পারে; কিন্তু লেখক কোনো পক্ষে অংশ গ্রহণ না করে নিরপেক্ষ থাকবেন। নিরপেক্ষতা কোষগ্রন্থের একটি প্রধান গুণ।

তৃতীয় প্রবন্ধটি বিশেষ পরিচিত বিষয়ের উপরে হবে। সুতরাং এই প্রবন্ধ পড়ে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন কোথায় কি ভুল ও ত্রুটি আছে।

উপরোক্ত বিচারপদ্ধতি থেকে ধারণা করা যেতে পারে কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে। কোষগ্রন্থের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সম্পাদকের

কৃতিত্বের উপর। পরিকল্পনা রচনার ভার এবং তা রূপায়িত করবার দায়িত্ব প্রধানত সম্পাদকের। কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করা হচ্ছে, তা তিনি সর্বদা মনে রাখবেন এবং লেখকদের রচনা ভাষ্য ও ভাবের দিক থেকে যাতে তাদের উপযোগী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদক স্মেলি উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "Utility ought to be the principal intention of every publication." কোষগ্রন্থের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য সার্থক হতে পারে যদি সম্পাদক পাঠকের চাহিদা অনুধাবনের জন্য সচেতন থাকেন।

কোষগ্রন্থের সম্পাদককে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বরং এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞের পক্ষে সকল বিষয়ের কোষগ্রন্থ সম্পাদনা কঠিন হয়ে পড়ে। যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি 'knows everything of something'; কিন্তু কোষগ্রন্থের সম্পাদককে জানতে হবে 'something of everything'. সকল বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকবার ফলে সম্পাদক কোনো লেখা পেলেই বুঝতে পারেন তা উদ্দেশ্যসাধক হবে কি না; কোথাও ভুল থাকলে তা-ও তাঁর পক্ষে ধরা সহজ হয়। ব্রটানিকার বর্তমান সম্পাদকের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি নেই। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্মদক্ষতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটানিকাকে ক্রমাগত সাফল্যের পথে নিয়ে চলেছে।

ব্রিটানিকার দপ্তর থেকে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের রচনা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অনেককে নতুনভাবে তাঁদের বক্তব্য লিখে আনতে বলা হয়েছে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে এসব সম্ভব হয় না।

কোষগ্রন্থ যাতে নির্ভরযোগ্য হয়, সেজন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রবন্ধ লেখানো হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখানো যে সব সময় নিরাপদ তা নয়। অনেক সময় তাঁরা নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করতে চান। পণ্ডিত ব্যক্তিদের একদেশদর্শিতার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ডাঃ জনসন ওট (oat) শব্দের অর্থ লিখেছিলেন: ইংলণ্ডে ঘোড়ার আর স্কটল্যাণ্ডে মানুষের খাদ্য। স্কটল্যাণ্ডের উপর আক্রোশটা তিনি এইভাবে মিটিয়েছিলেন। অথচ সে যুগের কত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

দিদেরো সম্পাদিত আটাশ খণ্ডের ফরাসী কোষগ্রন্থে ভলতেয়ার রুশো প্রভৃতি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাদের নিরপেক্ষ বলা যায় না। ফলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রথম দুই খণ্ড ফরাসী সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ব্রিটানিকার

অনেক প্রবন্ধ নিয়ে কাগজে ও সভায় সমিতিতে এককালে প্রবল বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। সম্পাদককে তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো প্রবন্ধে যেন বিতর্কমূলক আলোচনার অবকাশ না থাকে।

ব্রিটানিকার লেখকদের মধ্যে স্কট, হাক্সলি, মিল, মেকলে, সুইনবার্ন, ম্যাথু আর্নল্ড, ট্রটস্কি, বার্নার্ড শ, ফ্রয়েড, মেরি কুরি, নিলস্ বোহ্র প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা আছেন। তাঁরা ভিন্ন রুচির বিশেষজ্ঞ হলেও ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির পরিচয় নেই। তার কারণ সম্পাদক প্রথমেই লেখকদের প্রবন্ধ কিভাবে লিখতে হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ দিয়ে দেন। একটি নির্দেশ হল প্রসঙ্গটির মোটামুটি পরিচয় যেন প্রথম বাক্যেই দেওয়া হয়। যেমন Ablution কথাটি ধরা যাক। ব্রিটানিকা প্রথম বাক্যে এর অর্থটি বলে দিয়েছে: "a ritual washing destined to secure that ceremonial purity which must not be confused with the physical cleanliness obtained by the use of soap and water." মূল অর্থটি বলে নেবার পর এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়ে অর্থ জানবার জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় না। এমনি করে বিশেষজ্ঞরা সম্পাদকের নির্ধারিত ফরমুলা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করেন বলে ব্রিটানিকার মতো বিরাট গ্রন্থে সামঞ্জস্যহীনতা চোখে পড়ে না। বিশেষজ্ঞরা বিধিনিষেধ স্বীকার করেও যে লেখেন তার কারণ ব্রিটানিকায় লিখতে পারা বিশেষ সম্মানের কথা। ব্রিটানিকা প্রতি শব্দের জন্য দশ নয়া পয়সারও কম পারিশ্রমিক দেয়। ওদেশের তুলনায় এটা লোভনীয় নয়। সুতরাং অর্থের আকর্ষণটা লেখকদের পক্ষে বড় কথা নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৪শ সংস্করণ (১৯২৯) সম্পাদনার সময় ব্রিটানিকার কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। গান্ধীজী তখন জেলে; বোম্বাই সরকার কারাজীবনের তুচ্ছ নিয়ম-কানুনের মর্যাদাকে বড় করে সে চিঠি লণ্ডনে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

বড় বড় কোষগ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব আজকাল সাংবাদিকদের হাতে। সম্পাদনার পদ্ধতিও অনেকটা পত্রিকা সম্পাদনার রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। সংবাদ-পত্রের সহযোগিতা লাভ করে কোষগ্রন্থের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। ব্রিটানিকার নবম সংস্করণের পর আর কোনো সংস্করণ বের হবে কি না স্থির ছিল না। দু'জন ভাগ্যান্বেষী আমেরিকান প্রকাশক লণ্ডন টাইম্স্-এর সহযোগিতায় নবম সংস্করণ ব্রিটানিকা সস্তা দামে বিক্রি আরম্ভ করল। টাইম্সের প্রচারের ফলে এত

অধিকসংখ্যক সেট বিক্রি হল যা কেউ আশা করতে পারেনি। টাইম্‌স্‌ পত্রিকার তখন আর্থিক সঙ্কট চলছিল। বিক্রির লাভ থেকে টাইমস্‌-এর সঙ্কট দূর হল আর ব্রিটানিকার ভিত্তিও দৃঢ় হল। ব্রিটানিকার পরবর্তী কয়েকটি সংস্করণ প্রকৃতপক্ষে টাইম্‌স্‌-এর তত্ত্বাবধানেই সম্পাদিত হয়েছে। ব্রিটানিকার সাফল্য দেখে অনেক প্রকাশক কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রেরণা পেয়েছে।

ব্রিটানিকার নবম সংস্করণের পর থেকে কোষগ্রন্থ সম্পাদনার নীতি হল "democratizing the means of self-education." এই নীতি সফল করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। সেল্‌ফ্‌-এডুকেশানের কথায় মনে পড়ল, অনেক পাঠক সম্পাদককে জানান তিনি ব্রিটানিকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন। সব সময় যে এ দাবি সত্য হয় না তার প্রমাণ আছে। বার্নার্ড শ' যখন বেকার ছিলেন তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে বসে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি ছাড়া সমগ্র ব্রিটানিকা পড়েছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সি, এস, ফরস্টার দু'টি বিভিন্ন সংস্করণের ব্রিটানিকা সম্পূর্ণ পড়েছেন। এই দাবি দু'টি সত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আর একটি কারণে কোষগ্রন্থ সম্পাদনায় সাংবাদিকতার প্রভাব পড়েছে। পূর্বে যতদিন একটি সংস্করণ নিঃশেষ না হত ততদিন পর্যন্ত নতুন সংস্করণ সম্পাদনার কথা কেউ ভাবত না। ১৯২৯ সালে ১৪শ সংস্করণ বের হবার পর ব্রিটানিকার জন্য একটি স্থায়ী সম্পাদনা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্পাদক ও তাঁর সহযোগী ব্যতীত পঁচাত্তর জন উপদেষ্টা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই দপ্তরে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নতুন নতুন তথ্যের খবর আসে। সেই অনুসারে ব্রিটানিকার প্রবন্ধগুলির সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন হয়ে থাকে। নতুন করে লিখে নতুন সংস্করণ বের করবার জন্য অপেক্ষা করে থাকা যায় না। বার্নার্ড শ'র 'সোসালিজম্‌' প্রবন্ধটি বাতিল করে অন্য কাউকে দিয়ে ঐ বিষয়ের উপরে লেখানো হয়নি। শুধু বিশেষজ্ঞ দিয়ে সময়োপযোগী পরিবর্তন করানো হয়েছে। এই জন্যই ১৪শ সংস্করণের পর ত্রিশ বছরের মধ্যে ব্রিটানিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু পরিমার্জিত ও সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ হয়েছে অনেকবার। তাই ব্রিটানিকায় আধুনিকতম তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া গ্রাহকদের সুবিধার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে "ব্রিটানিকা বুক অব দি ইয়ার" নামক একটি বর্ষপঞ্জী বের করা হয়। এক বছরের সবকিছু ঘটনাবলী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির খবর এই বর্ষপঞ্জী থেকে পাওয়া যাবে। Continuous editing ও বর্ষপঞ্জী প্রকাশের এই পরিকল্পনা সকল প্রধান প্রধান কোষগ্রন্থ গ্রহণ করেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে সঙ্কলিত কোষগ্রন্থ আমাদের দেশে নেই বলা যেতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার্জন জেনারেল এডওয়ার্ড বালফুরের সম্পাদনায় The Cyclopaedia of India and of Eastern & Southern Asia—Commercial, Industrial and Scientific প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৫ সালে লণ্ডন থেকে বেরিয়েছিল তিন খণ্ডে। সম্পাদনার দিক থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এটি বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ; যদিও এতে ভুল আছে, এবং য়ুরোপীয়ান পাঠকের জন্য রচিত বলে ভারতীয়দের নিকট বিশেষ সমাদৃত হয়নি। ১৯০৭ সালে কলকাতা থেকে দু' খণ্ডে বেরিয়েছিল আর একটি "সাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়া"; ১৯২৪-২৫ সালে মাদ্রাজ থেকে লক্ষ্মীনারাশিয়া সঙ্কলন করেছিলেন "এনসাইক্লোপিডিয়া অব বেঙ্গল, বিহার এ্যাণ্ড ওড়িষ্যা"। তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এনসাইক্লোপিডিয়াও সঙ্কলন করেছিলেন। কিন্তু এই কোষগ্রন্থগুলির নাম যা-ই হোক, আসলে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি।

রেভারেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৮৪৬-১৮৫১) প্রকৃতপক্ষে কোষগ্রন্থের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। বিশ্বকোষ একালের পাঠকের দাবি মেটাতে অক্ষম। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে বিশ্বকোষই আমাদের প্রধান সহায়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান-ভারতী একটি সর্বদা ব্যবহারোপযোগী ছোট কোষগ্রন্থ রচনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। দুর্ভাগ্যক্রমে এর প্রকাশ অসম্পূর্ণ।

ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের জন্য আমাদের দেশে ছোট কোষগ্রন্থের প্রয়োজন বেশী। অথচ বড় কোষগ্রন্থ না থাকলে ছোট কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বড় কোষগ্রন্থগুলির সহায়তায় ছোট কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করা সহজ। একখণ্ডের একটি কোষগ্রন্থে অধিকাংশ প্রসঙ্গের জন্যই এক প্যারাগ্রাফের বেশী স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে এত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিয়ে লাভ নেই, অথচ ব্যয় বেশী পড়ে। লাভ নেই এই জন্য যে, লেখক তাঁর বিশেষ জ্ঞান এত স্বল্পপরিসরে পরিবেশন করতে পারেন না। ছোট কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে না পেলেও চলে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত লেখাগুলি দেখে অনুমোদন করে দিলেই হয়।

ভারতীয় ভাষার কোষগ্রন্থের একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বহির্বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংবাদ সাধারণ পাঠকের নিকট সহজলভ্য করে দেওয়া। যারা ইংরেজী বই থেকে বিশ্বের পরিচয় গ্রহণ করতে পারে না তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

দেশের মধ্যে ইংরেজী জানা ও ইংরেজী না-জানা দু'টি দলের সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয় জীবনে একটা মারাত্মক বিভেদ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সম্পদ আহরণ করে ইংরেজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সমাজের উঁচু স্তরে স্থান লাভ করেছে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে তা সকলের নিকট উপস্থিত করে দিতে না পারলে জাতির মধ্যে এই অন্তর্বিরোধ ঘুচবে না। এই সম্পর্কে কোষগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ব্রিটানিকার প্রবন্ধগুলি ছাপা হবার পূর্বে প্রায় ৫০০ ধাপের মধ্য দিয়ে আসে। তবু ব্রিটানিকা একেবারে নির্ভুল নয়। সুতরাং আমাদের দেশে যত সতর্ক হয়েই সম্পাদনা করা হোক না কেন, একবারের চেষ্টায় নির্ভুল ও উন্নতমানের কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় না। এখানে একটি কোষগ্রন্থ একবার প্রকাশিত হয়েই মারা যায়। এর ফলে অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে। এই জন্যই ভারতে কোষগ্রন্থের ঐতিহ্য এখনো সৃষ্টি হয়নি।

যাঁরা কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের পরিকল্পনা রচনা করেন তাঁদের একটি সংস্করণের কথা ভাবলেই চলবে না। বিভিন্ন ভাষার অন্তত একটি কোষগ্রন্থের ব্রিটানিকার মতো continuous editing-এর পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। তাহলে একটি কোষগ্রন্থ কেন্দ্র করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ক্রমাগত সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা কোষগ্রন্থটি নির্ভুল ও পাঠকদের আস্থাভাজন হতে পারবে।

একাজের জন্য টাকা প্রয়োজন। এতদিন কোষগ্রন্থের কাজ প্রধানত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হয়েছে। তাই অসম্পূর্ণতা ও ভুলভ্রান্তি নিয়ে প্রায় সবগুলি কোষগ্রন্থই হারিয়ে গেছে। নতুন পদ্ধতিতে সম্পাদনার ব্যবস্থা না করলে এখন যেগুলি সঙ্কলন করা হচ্ছে তাদের ভাগ্যও হবে অনুরূপ। কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য আর্থিক সাহায্য পেলে অবশ্যই ভালো হয়। কিন্তু আর্থিক সহায়তা অনেক সময় কোষগ্রন্থের ব্যবসায়িক ভিত্তি দুর্বল করে। অর্থাৎ, একজন প্রকাশক লাভের উদ্দেশ্যে যে নিয়মে বই প্রকাশ করে আর্থিক সাহায্য পেলে প্রায়ই তা হয় না। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রবন্ধ লিখতে পারেন, ছাপা-বাঁধাই চমৎকার হতে পারে, কিন্তু বইয়ের বাজারে নিজের গুণে স্থান করে নিতে না পারলে সব কোষগ্রন্থই স্বল্পায়ু হতে বাধ্য।

# বাংলা বইয়ের একাল ও সেকাল

বর্তমানে বাংলা ভাষায় বছরে কত বই বের হয়? ১৯৬১-৬২ সালের মোটামুটি হিসাব যা পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় ঐ বছর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২,০৪৩। বর্তমান অবস্থায় বছরে তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজারের বেশী বাংলা বই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমাদের প্রকাশন-শিল্পের অবস্থা, শিক্ষিতের হার, পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার মর্যাদা এমন নয় যে ঐ সংখ্যা অতিক্রম করা যেতে পারে। বাংলা দেশ খণ্ডিত হওয়ায় বাংলার প্রকাশনশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

প্রকাশিত পুস্তকের মোট সংখ্যাটি জানলেই বাংলা বইয়ের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায় না। কোন্ বিষয়ের উপর কত বই বেরিয়েছে তা থেকেই জাতির চিন্তাধারা কোন্ পথে চলেছে বুঝা যায়। জাতির কর্মসাধনার পরিচয়ও প্রকাশিত পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে। য়ুরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে পুস্তকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহারিক বিদ্যার উপরে প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত বই বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়ায় এইরূপ: সাধারণ শ্রেণী (অর্থাৎ, যে-সব বই কোনো বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে নয়)—১১; দর্শন—৬; ধর্ম—১৬; সমাজবিদ্যা—১১০; ভাষা ও ব্যাকরণ—১১; বিজ্ঞান—৪৪; ব্যবহারিক বিদ্যা—৪; ললিতকলা ও খেলাধূলা—২৮; সাহিত্য—৬৪৯, ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনী—৯৭। মোট সংখ্যা ১,০৩৬। এর মধ্যে পাঠ্য এবং বিষয়মূল্য নেই এমন বই ধরা হয়নি।

বাংলা বইয়ের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। প্রশ্ন এই যে, আমরা পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে কি এগিয়ে চলেছি না পিছিয়ে পড়ছি? যদি ক্রমোন্নতি হয়ে থাকে তাহলে গত একশ' বছরের মধ্যে কি পরিমাণ উন্নতি হয়েছে? ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলাকে শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার দাবি উঠেছে। এই সন্ধিক্ষণে বাংলা ভাষার শক্তি নির্ণয়ের জন্য একশ' বছর পূর্বে বাংলা বইয়ের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকারের মনে হল এই বিপ্লবের বাণী দেশে প্রচারিত হয়েছে ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত পুথিপত্রের মাধ্যমে। খুব অল্প সংখ্যক

ইংরেজই তখন বাংলা পড়তে পারত। সুতরাং বিদ্রোহের কথা বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে কি না গভর্নমেণ্টের পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। অথচ ভবিষ্যতে এরূপ বিপ্লব যাতে না হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে এ বিষয়ের সত্যতা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সরকার বাংলা ভাষায় ১৮৫৭ সালে যত পুথিপত্র বেরিয়েছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার ভার দিলেন রেভারেণ্ড লঙের উপর। লঙ সাহেবের বিস্তৃত রিপোর্ট আছে বলে বাংলা বইয়ের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে শতাধিক বৎসর পূর্বেকার প্রকাশনশিল্পের তুলনামূলক বিচার সম্ভব।

লঙ সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের হিসাব এইরূপ :

| পুস্তকের বিষয় | পুস্তকের সংখ্যা | মুদ্রণ সংখ্যা |
|---|---|---|
| অশ্লীল ও কাম সম্বন্ধীয় | ১৩ | ১৪,২৫০ |
| আইন | ৫ | ৪,০০০ |
| খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় | ৮ | ৯,৫৫০ |
| গল্প-উপন্যাস | ২৮ | ৩৩,০৫০ |
| জীবনী ও ইতিহাস | ১৫ | ২০,১৫০ |
| নাটক | ৮ | ৫,২৫০ |
| নীতি-কথা | ১৯ | ৩৯,৭০০ |
| পঞ্জিকা | ১৯ | ১,৩৬,০০০ |
| পুরাণ ও হিন্দুধর্ম | ৮৫ | ৯৬,১৫০ |
| বিজ্ঞান | ৯ | ১২,২৫০ |
| বিবিধ | ১২ | ১৮,৩৭০ |
| মুসলমানী পুস্তক | ২৩ | ২৪,৬০০ |
| শিক্ষা | ৪৬ | ১,৪৫,৩০০ |
| সংবাদপত্র | ৬ | ২,৯৫০ |
| সংস্কৃত-বাংলা | ১৪ | ১৫,০০০ |
| সাময়িক পত্র | ১২ | ৮০০ |
| মোট | ৩২২ | ৫,৭৭,৩৭০ |

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৫৭ সালে প্রত্যেকটি বই গড়ে প্রায় ১,৭৯৩ কপি ছাপা

হয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালের পরিসংখ্যানে আমরা মুদ্রিত কপির সংখ্যা দিতে পারিনি। তথাপি একথা বলা যায় যে, ১৮৫৭ সালে প্রতি পুস্তকের গড় কপির যে সংখ্যা ছিল বর্তমানে আমরা সে সংখ্যা অতিক্রম করতে পারিনি। খ্যাতনামা কয়েকজন লেখকের উপন্যাস এবং পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোনো বই সাধারণত হাজার কপির বেশী ছাপা হয় না। সুতরাং শতাধিক বছর পূর্বেকার গড় সংখ্যা ১,৭৯৩ বর্তমানের তুলনায়ও ভালো বলা যেতে পারে।

লঙ সাহেব সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা তাঁর হিসাবের মধ্যে ধরেছেন। ১৯৬১-'৬২ সালের হিসাবে দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা বাদ দেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সেকালের কয়েকটি বইয়ের মুদ্রণ-সংখ্যা দেওয়া হলঃ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাপা হয়েছিল ২,০৫০ কপি; ১৮০ পৃষ্ঠার বই, দাম বারো আনা। রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' প্রতি মাসে ছাপা হত ৭৫০ কপি; প্রতি কপির দাম ছিল এক আনা। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত 'শব্দাম্বুধি' অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল তিন হাজার কপি। ৩৮ হাজার শব্দ সম্বলিত ৬১৫ পৃষ্ঠার এই বইয়ের দাম ছিল আড়াই টাকা। আহিরীটোলার বিদ্যারত্ন প্রেস থেকে এক আনা দামের একটি পঞ্জিকার ২০,০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ছাপা হয়েছিল হাজার কপি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বই বেশী করে ছাপা হত। কারণ তাঁর অধিকাংশ বই-ই পাঠশালা ও স্কুলের পাঠ্য ছিল। "বর্ণ-পরিচয়" প্রথম ভাগের নবম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল দশ হাজার কপি। দু'বছরে নয়টি সংস্করণে বর্ণ-পরিচয় বিক্রি হয়েছে আটান্ন হাজার কপি।

১৮৫৭ সালে বাংলা বইয়ের এরূপ জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর মনে হয় যখন দেখি ১৮২০ সালে বাংলা ভাষায় মাত্র ত্রিশখানি বই বেরিয়েছিল। ১৮৫২ সালে নতুন বই প্রকাশিত হয়েছিল পঞ্চাশখানি। অথচ ১৮৫৭ সালেই তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২২। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধির উপযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। লঙ সাহেবের হিসাবকে বিশ্বাস করতে হয় নানা কারণে। তিনি নিজে কলকাতার ছাপাখানাগুলি ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর সঙ্কলিত তথ্যের সমর্থন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালে একটি স্পেশাল আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাকরকে পুলিশের নিকট মুদ্রিত পুথিপত্রের এক কপি করে দিতে হত। পুলিশের হিসাবের সঙ্গে লঙ সাহেব নিজের তথ্য মিলিয়ে দেখেছেন।

১৮৫৭ সালে মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যার মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত বইয়ের হিসাব ধরা হয়নি। ঐ বছর মিশনারিরা বিতরণ করেছে প্রায় ৭৭,০০০ কপি; হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশিত ও বিতরিত কপির সংখ্যা ৬,৫৬,০০০ অতিক্রম করেছিল।

সে যুগে বাংলা বইয়ের দোকান ছিল না। পুস্তক প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দেবার সুযোগও ছিল সামান্যই। ছাপাখানা থেকেই বই বিক্রি করা হত। ঝাঁকায় বই বোঝাই করে ফিরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি বই নিয়ে ঘুরে বেড়াত। বাড়িতে বসে নানারকম বই দেখে পছন্দ মতো বই কেনার সুযোগ ছিল তখন। তথাপি বর্তমানে বাংলা বই বিক্রির যে-সব ব্যবস্থা আছে একশ' বছর আগে তা ছিল না। বিক্রির উন্নত ব্যবস্থার অভাব সত্ত্বেও যে এত বই প্রকাশিত হত তা সত্যি বিস্ময়কর।

বিগত শতাব্দীতে বাংলা দেশে নবজীবনের প্রেরণা এসেছিল। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল নতুন নতুন বইয়ের। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের উপর নতুন নতুন বই লিখে দেশের সকল স্তরে নবজীবনের বাণী প্রচার করবার উদ্দীপনা এসেছিল। দেশ-বিদেশের ভাবধারা বাংলাভাষীদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য অনুবাদেরও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল; তাই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রাধান্য দেখা যায়। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি এবং বিভিন্ন খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান বাংলা বই প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষরূপে উদ্যোগী ছিল। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নেই।

বাংলা বইয়ের বাজার তখন বর্তমান অপেক্ষা ব্যাপক ছিল। অখণ্ড বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলা বই বিক্রি হত। লঙ সাহেব বলেছেন যে, ভবিষ্যতে হয়ত অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষা থাকবে না, বাংলা ভাষাই আসাম ও উড়িষ্যার একমাত্র ভাষা হবে। কারণ, ঐ দুই প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই বাংলা বই পড়ত। কাশী থেকে দু'টি বাংলা সংবাদপত্র বের হত। সেখানে বাংলা ছাপাখানা ছিল এবং বাংলা বই প্রকাশ করবার ব্যবস্থাও ছিল।

এখন বাংলা বই প্রায় সবই কলকাতায় প্রকাশিত হয়। মফঃস্বল থেকে উল্লেখযোগ্য বই পাওয়া যায় না। এর ফলে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রধানত কলকাতার জীবনেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। শতবর্ষ পূর্বে যদিও কলকাতায় অধিকাংশ বই বের হত তথাপি মফঃস্বল কেন্দ্রগুলির দানও উপেক্ষণীয় ছিল না।

বর্ধমান, শ্রীরামপুর, ঢাকা, বরিশাল, প্রভৃতি শহর থেকে বাংলা সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাওয়া গেছে।

একশ' বছর পূর্বে বাংলা দেশের মফঃস্বল অঞ্চলে শতকরা তিনজনের বেশী বই পড়ে বুঝতে পারত না। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে বাংলা দেশে শতকরা সাক্ষরের হার ছিল প্রায় চব্বিশ। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে ভারতে সাক্ষরের হার প্রায় ষোলো থেকে চব্বিশে উঠেছে। বাংলায় সাক্ষরের হার শতকরা প্রায় ত্রিশ হয়েছে। অবশ্য সাক্ষর হলেই স্বাধীনভাবে বই পড়া যায় না। সাক্ষরের এক অংশ মাত্র বই পড়তে পারে। তথাপি একশ' বছর পূর্বের হার শতকরা তিন জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন অন্ততঃ কুড়ি বা তার কাছাকাছি কোনো সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। বইয়ের (টাইটেলের) সংখ্যা ৩৩২ থেকে একশ' বছরে হয়েছে ২,৩৩৭। কিন্তু বাংলা বইয়ের কপির সংখ্যা সে তুলনায় বিশেষ বেড়েছে বলে মনে হয় না।

বইয়ের বিষয়বস্তু বিচার করলে দেখা যাবে ১৮৫৭ সালে ছিল মূলত বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের যুগ। ইংরেজী, সংস্কৃত, ফার্সী থেকে অনুবাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। মৌলিক সৃষ্টি ছিল কম। তখন সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারটাই ছিল বড় কথা। এখন সাহিত্য গভীর হয়েছে, মৌলিক সৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং সাহিত্যে এসেছে বিষয়-বৈচিত্র্য। গুণের বিচারে ১৮৫৭ সালের বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা বর্তমান সাহিত্য এত উন্নত যে এদের মধ্যে তুলনা চলে না।

মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা থেকে বুঝা যায় সাহিত্য জাতীয় জীবনে কতটা স্থান অধিকার করে আছে। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব আমাদের জীবনে যতটা ব্যাপক হওয়া স্বাভাবিক ছিল তা হয়নি। ১৮৫৭ সালে প্রস্তুতি পর্বে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল তার সফল পরিণতি এতদিনেও হল না।

না হবার কারণ বাংলা সাহিত্যকে আমরা এখনো মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। মুসলমান আমলে আমাদের রাজভাষা ছিল ফার্সী; তার আগে হিন্দু আমলে ছিল সংস্কৃত। ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজী রাজভাষা হয়েছে। এত দিন পর্যন্ত বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেনি। এই মর্যাদা লাভ না করেও বাংলা সাহিত্যের যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করলে বাংলা সাহিত্যের বহুগুণ বেশী উন্নতি হতে পারত।

বাংলা বই এখনো প্রধানত চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত হয়। তাই প্রকাশিত মোট গ্রন্থের অর্ধেকই গল্প উপন্যাস নাটক রম্যরচনা প্রভৃতি শ্রেণীর সাহিত্যগ্রন্থ। জীবনযাত্রায় যে ভাষা সহায়তা করে না তার জন্য মমতা গভীর না হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের জীবিকার্জনে সাহায্য করে ইংরেজী। যে কোনো বৃত্তি অবলম্বন করা হোক না কেন বাংলা বইয়ের উপর নির্ভর করা যায় না। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, শিক্ষকতা, ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে কিছু শিখতে হলে ইংরেজী বই ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। চাকরি করতে হলেও ইংরেজীর জ্ঞান না হলে চলে না। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অত্যাবশ্যক নয়। বাংলা রাষ্ট্রভাষা নয় এবং উচ্চতম শ্রেণীর শিক্ষার বাহন নয় বলেই এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর একখানি বাংলা উপন্যাস নিয়ে বসলে কিছু আনন্দ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের মূল্য এইটুকুর মধ্যে প্রধানত সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু ইংরেজীর প্রভাবে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট এই আনন্দলাভের ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ। ইংরেজী বই যে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে তার কাছে বিশ্বসাহিত্যের দ্বার মুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ পরিসরে সে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চায় না। আরও বিপদ এই যে, সকল দেশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তুলনায় নিজের দেশের সাধারণ কিংবা ভালো লেখকদের রচনা তুচ্ছ মনে হয়। আরও একটা কথা আছে। জীবনের অত্যাবশ্যক ব্যয় মিটিয়ে বই কেনার মতো উদ্বৃত্ত অর্থ খুব কম লোকেরই আছে, এবং যা থাকে তার পরিমাণ সামান্য। সেই সামান্য অর্থেও ইংরেজী বই একটা বড় ভাগ বসায়। ইংরেজীর প্রাধান্য না থাকলেও আমরা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি পড়তাম। পড়া প্রয়োজন। ইংরেজী না জানলে বাংলা অনুবাদ পড়তাম এবং তাহলে আমাদের প্রকাশনশিল্প লাভবান হত।

বাংলা সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব প্রতিফলিত হতে অনেক বিলম্ব ঘটবে।

# জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা

একটি বিদেশী ভাষা কখনও সর্বসাধারণের ভাষা হতে পারে না। দেশের সকল স্তরের নরনারীর মধ্যে ভাবগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য স্থাপনের জন্য মাতৃভাষাকে জীবনের সকল পর্যায়ে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া সুদৃঢ় জাতীয় সংহতি অসম্ভব। সুতরাং এদেশ থেকে ইংরেজীকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজীর আধিপত্য আমরা স্বীকার করেছি ; আজ হঠাৎ তাকে অধিকারচ্যুত করা যায় না। যদি তা করতে যাই, তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে।

ভারতীয় ভাষায় বইয়ের অভাবটাই হবে ক্ষতির কারণ। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বইকেও বিদায় দিতে হবে। কিন্তু তার বদলে ভারতীয় ভাষায় বই যদি না পাই, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? আমাদের সেই যুগে পিছিয়ে যেতে হবে, যখন বই ছিল না। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। বই যা বের হয়, তার প্রায় সবই গল্প-উপন্যাস-কবিতা এবং পাঠ্যপুস্তক। জাতি গঠন ও জীবিকার্জনের জন্য যে-সব বই প্রয়োজন, আমাদের সাহিত্যে তাদের একান্ত অভাব। আমাদের সাহিত্যে 'ওয়ার্কস অব ইমাজিনেশান' বা গল্প, উপন্যাস ও কাব্য গ্রন্থেরই একাধিপত্য। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, রেফারেন্স বই, প্রভৃতির অভাব এতদিন ইংরেজী বই দিয়ে মেটানো হয়েছে। আমাদের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য বইগুলি ইংরেজীতে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় জানতে হলেও ইংরেজীর সাহায্য নিতে হবে।

এতদিন ইংরেজীর উপর নির্ভর করে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে ছিলাম। এখন সেই দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এবং এতদিনের অবহেলার মূল্য না দিলে, ইংরেজী ভাষাকে বিদায় দেবার কথা উঠতেই পারে না। উপযুক্ত প্রস্তুতির পর ইংরেজী বর্জনের তারিখ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, তার আগে নয়। ইংরেজী বই থাকবে, কিন্তু ইংরেজী পড়া বন্ধ হবার ফলে সে বই কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তাহলে আমাদের ছাত্রেরা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করবে কিসের সাহায্যে ? আর এই শিক্ষার সুযোগ যদি আমরা করে দিতে না পারি, তাহলে জাতি হিসাবে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে অনেক

আলোচনা হয়েছে; কিন্তু ভাষা বদলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এই মৌলিক সমস্যাটি সমাধানের পথ এখনও যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

ভারতীয় ভাষায় পুস্তক রচনার সমস্যা যে কিরূপ জটিল এবং তার জন্য যে কি বিরাট প্রস্তুতি প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। এটা শুধু ইংরেজী বনাম রাষ্ট্রভাষার সমস্যা নয়; ভারতের প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান ভাষা এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিগুলির সঙ্গে সমান পর্যায়ে চলতে হলে জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে। জীবনের সকল ভাবনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল তথ্য জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা চাই। ব্যবহারিক ও আত্মিক জীবনকে গড়ে তোলবার মতো উপযুক্ত বই যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হওয়া সম্ভব নয়।

ইংরেজী, ফরাসী বা জার্মান সাহিত্য জাতির যে দাবি পূরণ করে, ভারতীয় সাহিত্যকে যদি সেই দাবি পূরণ করতে হয়, তাহলে কত বইয়ের প্রয়োজন? ডঃ সি, পি, রামস্বামী আয়ার মনে করেন যে, প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার মোট পুস্তক সংখ্যা অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ হওয়া চাই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভাষায় তিন চার লক্ষ বই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সাহিত্যের উপর আমাদের দাবি এত ব্যাপক হবে যে, সেই তুলনায় এই সংখ্যা মোটেই বেশী নয়। কিন্তু এদেশে প্রকাশনশিল্প যে স্তরে আছে, তাতে এত বই বের করবার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের প্রকাশনশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা তুলনায় খুবই কম। হিন্দীতে সবচেয়ে বেশী বই বের হয় আজকাল; তা-ও বছরে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশী নয়; বাংলায় ২,৫০০; অসমীয়া ১৫০; সংস্কৃত, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় ৩০০ থেকে ৫০০; গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় ১,০০০ থেকে ১,৫০০। এই হল বার্ষিক গড় প্রকাশনের হিসাব। অর্থাৎ গড়ে আমাদের প্রকাশকরা প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষায় ১৭,০০০।১৮,০০০ বই প্রকাশ করে। এ সব বইয়ের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ নোট বই এবং বাজে বই।

ভারতীয় প্রকাশনের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। চাহিদা কম বলে অধিকাংশ বইয়ের খুব অল্পসংখ্যক কপি ছাপানো হয়। কিছুদিন পরেই বই পাওয়া যায় না। তার ফলে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। আমেরিকায় ( যুক্তরাষ্ট্রে ) বার্ষিক গড়ে বারো হাজার বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেখানে যে কোন বছর, যে কোন সময় এক লক্ষ থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার বই 'ইন্ প্রিণ্ট' থাকে, অর্থাৎ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও প্রায় অনুরূপ-

সংখ্যক বই বাজারে সব সময়েই মজুদ থাকে। এ ছাড়া ইংরেজী ভাষায় এমন কয়েক লক্ষ বই আছে, যা বাজারে কিনতে পাওয়া না গেলেও লাইব্রেরিতে সহজেই পড়তে পাওয়া যাবে। আর আমাদের দেশের আনুমানিক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বাজারে হিন্দী বইয়ের সংখ্যা হাজার পাঁচেক ; অন্যান্য ভাষায় সাধারণত হাজার দুই বই মজুদ থাকে। অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় 'ইন্ প্রিণ্ট' বইয়ের সংখ্যা হাজার বা তারও কম। যে সব ইংরেজী বই বর্তমানে কিনতে পাওয়া যায় না, লাইব্রেরি থেকে তাদের পড়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই বলে গত একশ' বছর যাবৎ ভারতীয় ভাষার বই কোথাও নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হয়নি। সুতরাং অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করবার জন্য বহু বই নতুন করে ছাপতে হবে।

আমাদের প্রকাশনশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা যদি বার্ষিক আঠারো হাজার বই হয়, তাহলে এই হারে পঞ্চাশ লক্ষ বই প্রকাশ করতে লাগবে প্রায় পৌনে তিন শ' বছর। আর যদি কোনো সুপরিকল্পিত পদ্ধতি গ্রহণ না করে প্রকাশকরা এখনকার মতো নিজেদের খুশি অনুযায়ী বই প্রকাশ করে চলে তাহলে পৌনে তিন শ' বছর পরেও শুধু গল্প-উপন্যাস-কবিতার সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, জাতিগঠনমূলক বইয়ের দৈন্য সমানই থাকবে।

পঞ্চাশ লক্ষ বই ছাপতে কত টাকা লাগতে পারে? পঞ্চাশ লক্ষ বইয়ের ( টাইটেল ) হাজার কপি করে যদি ছাপা হয় তাহলে মোট কপির সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ শ' কোটি। প্রতি কপির জন্য গড় খরচা খুব কম করে ধরলেও দু'টাকা হবে। তাহলে অন্তত এক হাজার কোটি টাকা চাই।

পঞ্চাশ লক্ষ বই এবং এক হাজার কোটি টাকার কথা হঠাৎ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু এটা মোটেই অবান্তর হিসাব নয়। ভারতের ৭৩ জন নাগরিকের জন্য একখানা করে বই গড়ে ধরলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বই প্রয়োজন। ইউনাইটেড কিংডমে 'ইন প্রিণ্ট' বইয়ের সংখ্যা প্রতি পাঁচ জনের জন্য একখানিরও বেশী। আজ থেকে দশ কিংবা বিশ বছর পরে ৭৩ জনের জন্য একখানি বইও যদি না দিতে পারি তাহলে জাতীয় সাহিত্য যে জাতিগঠনের কাজের সহায়ক হবে এমন আশা করা চলে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, সুতরাং এখনই এত বইয়ের কথা না ভাবলেও চলে। নিরক্ষরতার জন্য বইয়ের কাটতি কম হবে, প্রকাশন ক্ষেত্রে তার ফলে সমস্যা বাড়বে ; কিন্তু টাইটেলের চাহিদা কমাবার কোনো কারণ নেই। শিক্ষিতের সংখ্যা কম হলেও জীবনকে

সমগ্রভাবে জানবার জন্য সকল ধরনের বই এদের হাতে তুলে দিতে হবে।

জাতিগঠনমূলক এই বৃহৎ কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগগুলি উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচিত হয়েছে ; কিন্তু প্রকাশনশিল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান এবং এই শিল্প প্রসারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা হয়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমরা ইংরেজী ভাষা বিদায় দেবার কথা ভাবতে পারি, তার আগে নয়।

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে :

(১) প্রকাশনশিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং তা উন্নত করবার উপায়। প্রকাশনশিল্পে কত পুঁজি খাটছে ও এই পুঁজি কি করে বাড়ানো যেতে পারে ;

(২) ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ পদ্ধতির উন্নতির পন্থা নির্ধারণ। দেশের সকল অঞ্চলে বহু সংখ্যক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে পুস্তকের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি হয় তার ব্যবস্থা করা ;

(৩) বহুসংখ্যক নতুন লেখকের প্রয়োজন হবে। প্রতিভাবান নতুন লেখকদের খুঁজে বের করে প্রত্যেককে যোগ্যতানুযায়ী কাজ দেওয়া ;

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত পরিভাষা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সঙ্কলন করা। এগুলি হাতের কাছে না থাকলে লেখকদের পদে পদে অসুবিধা হবে ;

(৫) সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন হবে অগ্রাধিকার স্থির করা। কোন্ শ্রেণীর বই আগে প্রয়োজন তা বিবেচনা করে সে ধরনের বইগুলি প্রথম প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে অন্তত পাঁচ লক্ষ বই প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা চাই। পুস্তক উৎপাদনের বর্তমান হিসাব অনুসারে পাঁচ লক্ষ বই প্রকাশ করতে ২৮।২৯ বছর প্রয়োজন। এই সময়কে পাঁচ অথবা দশ বছরে কমিয়ে আনতে হবে। পাঁচ লক্ষ বই বের হলে ৭৩০ জন ভারতীয়ের জন্য একখানি করে বই পাওয়া যাবে। পাঁচ লক্ষ বই প্রকাশের পরিকল্পনা যদি সর্বাত্মক না হয় এবং পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকরী করবার উদ্যম যদি না থাকে তাহলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন বি-এ পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে পড়া যায়। অবশ্য বইয়ের অভাবে কোনো

কোনো বিষয় বাংলায় পড়া সম্ভব নয়। এর ফলে এম-এ পড়তে গিয়ে কঠিন ইংরেজী বইগুলি নিয়ে ছাত্ররা বিপদে পড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রদের পক্ষেও এই একই সমস্যা। শুধু পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সমস্যা নয়। অর্থোপার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ইংরেজীর জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ফাইলে নোট লিখতে অথবা রিপোর্ট লিখতে ইংরেজী চাই; প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতার প্রমাণ এখনো দিতে হয়। অথচ স্কুল কলেজে ইংরেজী পড়ানো কমিয়ে দিয়ে বনিয়াদ কাঁচা করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। ছাত্র অবস্থায় ইংরেজীর উপর জোর দেওয়া হয় না বলে পরবর্তী জীবনে স্বচ্ছন্দে ইংরেজী বই পড়বার ক্ষমতা এবং আগ্রহ প্রায়ই থাকে না। বাংলা বইও নেই যে তা পড়বে। সুতরাং বইয়ের সাহায্যে মনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ খুব সঙ্কীর্ণ। যে-সব বাংলা বই আই-এ, বি-এ পরীক্ষার ছাত্ররা পড়ে তাদের অধিকাংশই নোট জাতীয়; মৌলিক বই নয়। পরিণামে সকল বিষয়ের ভাসা-ভাসা পরিচয় নিয়ে আমাদের সংসারে প্রবেশ করতে হয়। মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষার এই দ্বৈত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারলে ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়। জাতীয় সাহিত্য পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যই হবে মাতৃভাষায় সকল পর্যায়ের গ্রন্থ রচনা করে এই দ্বৈত প্রভাবকে দূর করা।

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের জন্য কেমন করে পরিকল্পনা রচনা করতে হয় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে রাশিয়ার কাছ থেকে। সোভিয়েট রাশিয়া গোড়া থেকেই বুঝেছিল যে, গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্য উপযুক্ত বই হল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুস্তক প্রকাশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়া এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুস্তকের প্রকাশক। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় যে পরিমাণ পুস্তক প্রকাশিত হত সেই তুলনায় বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম দশকের শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৭ গুণ; দ্বিতীয় দশকের শেষে বৃদ্ধি পায় ৫৪৪ গুণ। ১৯১৩ সালে গড়ে একটি পুস্তকের ৩,৩০০ কপি ছাপা হত; ১৯৪৬ সালে এই গড় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০,০০০।

স্ট্যালিনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮-১৯৩২) অনুসারে ২,৩১,০০০ বই (টাইটেল) প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রকাশকদের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বই প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জীবনের যে সব বিভাগের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেই সম্বন্ধীয় বই প্রকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায়

পরিকল্পনার শেষে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের পুস্তকের উৎপাদন কত গুণ বেড়েছে তা নীচের তালিকা থেকে দেখা যাবে :

| বিষয় | কতগুণ বেড়েছে |
|---|---|
| সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি | ৩·১ |
| টেক্‌নিক্যাল বই | ৫·৬ |
| বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি | ৫·৬ |
| রাশিয়ান ভাষাসমূহের উপর বই ( পাঠ্যপুস্তক, ম্যানুয়েল ইত্যাদি ) | ২ |
| গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | ২·৭ |

এমনি করে প্রত্যেকটি পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী পুস্তকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ক্রমশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জাতির যে বই আশু প্রয়োজন নেই তা প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। ১৯৫৬ সালে ৫৯,৫৩০খানি বই ( টাইটেল ) বেরিয়েছে ; মোট কপি ছাপা হয়েছে প্রায় এক শ' সাতাশ কোটি। এর মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ হল বিজ্ঞানের বই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের ব্যবস্থা না থাকলে পুস্তক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া এরূপ বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করতে পারত না।

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনায় রাশিয়া নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ করেছিল : (১) পরিকল্পনায় ব্যবহারিক জীবনের যে-সব ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে, সে-সব বিষয় সম্বন্ধে বই রচনা করা ; (২) প্রদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি সাধন করে সেই সব ভাষায় বই লেখার ব্যবস্থা। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় ৪৯টি ভাষায় বই ছাপা হত ; এখন ১২২টি ভাষায় বই বের হয়। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক আত্মোন্নয়নের সুযোগ পাবে। সুতরাং সকল নাগরিকই যাতে তার মাতৃভাষায় বই পড়তে পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে ; এই সুযোগ না পেলে জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ পিছিয়ে থাকবে। তাতে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি। (৩) সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রেখেছেন যাতে একই বিষয়ের বই অনাবশ্যকরূপে দু'খানি প্রকাশিত না হয়। এর ফলে লেখকের শক্তির অপব্যয় এবং উৎপাদনের খরচা বেঁচেছে। এই নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এত বেশী সংখ্যক নতুন নতুন বই অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। (৪) ১৯২৮ সালের রাশিয়ান বইয়ের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী প্রকাশিত হয়েছিল মস্কো ও লেনিনগ্রাদ শহরে। বহুদিন যাবৎ উল্লেখযোগ্য বাংলা বই একমাত্র কলকাতা থেকেই বের হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বই প্রকাশের সুযোগ থাকলে সমগ্র দেশের জীবন ও সাধনার প্রভাব জাতীয় সাহিত্যের উপর পড়বে ;

তাহলে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ হতে পারে। সোভিয়েট সাহিত্য উন্নয়নের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা প্রথম থেকেই পুস্তক প্রকাশের কেন্দ্র দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের যে প্রধান্য ছিল এখন তা ক্রমশ কমে আসছে। (৫) আমাদের দেশে ছোট বড় প্রকাশকের সংখ্যা প্রায় আট দশ হাজার। রাশিয়ায় আছে মাত্র দু'শর কিছু বেশী প্রকাশন সংস্থা। এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সংখ্যায় অল্প বলে কর্তৃপক্ষ সহজেই এদের মাধ্যমে প্রকাশননীতি কার্যকরী করতে পারে। সরকার-নিয়ন্ত্রিত এই প্রকাশন সংস্থাগুলি রাশিয়ার জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৩৫ সালে বিয়াট্রিস ওয়েব মন্তব্য করেছেন :

"...... ..in the U.S.S.R., it is the State publishing house, rather than the University professoriate or even the great army of school teachers, that is, in the service of general culture, the most potent agency."

নয়া চীন রাশিয়ার পরিকল্পনার মূল আদর্শ গ্রহণ করে গত কয়েক বছরের মধ্যে পুস্তক প্রকাশনায় সাফল্যলাভ করেছে। অনগ্রসর ভাষাগুলিকে উন্নত করা চীনেরও লক্ষ্য। আমাদের ভাষা সমস্যাও এ ভাবেই সমাধান করা যায়। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক সংবিধানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষায় কথা বলে। বাকি আট নয় কোটি লোকের জীবনকেও পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে তাদের মাতৃভাষায় বই দিয়ে। বই না পেলে এরা জাতির দায়স্বরূপ হয়ে থাকবে। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, শুধু রাষ্ট্র ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলে জাতীয় সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

জাতীয় সাহিত্য পরিকল্পনা রচনায় কোন্ শ্রেণীর বই প্রাধান্য লাভ করবে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

অভিধান ও ভাষাবিষয়ক বই : ভাবজীবন ও কর্মজীবনের সকল চিন্তা ভাবনাকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করবার জন্য শক্তিশালী ভাষা চাই। ভাষা সমৃদ্ধ করবার জন্য উপযুক্ত পুথিপত্র রচনার দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি দিতে হবে। ইংরেজী থেকে সকল ভারতীয় ভাষার অভিধান প্রথমেই আবশ্যক। কারণ, ইংরেজী সাহিত্য থেকে আমাদের অনেক বই অনুবাদ করতে হবে ; তা ছাড়া বই অনুবাদের প্রয়োজন

যেখানে নেই সেখানেও নতুন নতুন চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের ভাষায়।

বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য পরস্পরের ভাষা জানা চাই। খুব অল্প সংখ্যক লোকই অবশ্য নতুন একটি ভাষা শিখতে পারে। কিন্তু যারা শেখে তারা অনুবাদের সাহায্যে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়ে দিতে পারে। যাদের শক্তি ও আগ্রহ আছে তাদেরও মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্য ভাষা শেখার সুযোগ নেই। বাঙলার মাধ্যমে আমরা তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, মারাঠী শিখতে পারি না। অথচ জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যে এই সুযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। ভাষা শেখার জন্যই প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষা থেকে বাঙলা এবং বাঙলা থেকে অন্য ভাষার অভিধান প্রয়োজন হবে। প্রত্যেকটি ভাষায় এরূপ অভিধান এবং ভাষা শিক্ষার ম্যানুয়েল রচিত হলে জাতীয় সংহতির পথ যত সুগম হবে শুধু বক্তৃতায় তা হবার আশা নেই।

রেফারেন্স বই: জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজনও প্রথমেই হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা এবং নতুন নতুন বিষয়ে বই লেখা পদে পদে রেফারেন্স বইয়ের অভাবে ব্যাহত হয়। নির্ভরযোগ্য তথ্য সঙ্কলন করে রাখাই রেফারেন্স বইয়ের উদ্দেশ্য। শুধু ভারতীয় ভাষায় নয়, ভারত সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায়ও রেফারেন্স বইয়ের অভাবটা পীড়াদায়ক। এর ফলে লেখকদের বার বার প্রয়োজনীয় তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে খুঁজে নিতে হয়। খুঁজে নেবার মতো ধৈর্য ও শক্তি যাদের নেই তাদের লেখায় প্রায়ই তথ্যের ভুল পাওয়া যায়। ইংরেজ লেখকদের জন্য আছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অবাধ সঞ্চরণ ক্ষেত্র। ব্রিটানিকায় পরিবেশিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কারো মনে প্রশ্ন জাগে না।

প্রথমে এক খণ্ডের একটি কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করলে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠী উপকৃত হবে। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর একটি বৃহৎ কোষগ্রন্থ রচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। এই দু'টি কোষগ্রন্থেই পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য থাকবে। এ ছাড়া শুধু ভারত সম্বন্ধেও একটি রেফারেন্স বই সঙ্কলন করা যেতে পারে।

এই সাধারণ কোষগ্রন্থগুলি ব্যতীত চরিতাভিধান এবং শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অভিধানও সমাদৃত হবে। তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, মারাঠী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় বড় বড় কোষগ্রন্থ রচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। মারাঠী ভাষায় যে জীবনীকোষটি প্রকাশিত হয়েছে উৎকর্ষের

দিক থেকে অনুরূপ বিদেশী গ্রন্থের সঙ্গে সেটি তুলনীয়। রেফারেন্স বই প্রকাশের উদ্যম বাংলা ভাষায় বিশেষ লক্ষ্যণীয় নয়।

পাঠ্যপুস্তক : অভিধান ও রেফারেন্স বই পাওয়া গেলে নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনার পথ সুগম হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে যাতে শিক্ষা লাভ করা যায় তার ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্বও জাতীয় সাহিত্য পরিকল্পনা সংস্থার।

ইতিহাস, ভূগোল ও সভ্যতা : সাধারণ পাঠকদের জন্য ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস ; ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, অর্থনীতির সুখপাঠ্য ইতিহাস ; ভারতের ভূগোল ( একমাত্র আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য ভূগোলটি বিদেশী লেখকের রচনা ) ; ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের সুলিখিত ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিচয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাধারণ বইগুলি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় বিষয়গুলি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করে সেই সম্বন্ধে বই লিখতে হবে। যেমন, ভারতের গাছ, প্রাণী ও খনিজ পদার্থের উপরে বই ; এবং ভারতীয় কৃষক, তাঁতি প্রভৃতির কাজে সহায়তার জন্য উপযুক্ত ম্যানুয়েল।

সমাজবিদ্যা : নৃ-বিদ্যা, অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের বই।

এ ছাড়া অনুবাদ, শিশু-সাহিত্য এবং চিত্তবিনোদনের বই রচনার জন্যও পরিকল্পনা করতে হবে। বিদেশী ও ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতরা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে-সব মূল্যবান গ্রন্থ ইংরেজীতে রচনা করেছেন তাদের অনুবাদ না হলে বিশ পঁচিশ বছর পরে ক'জন আর পড়তে পারবে ?

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্যকর করবার পথে অনেক বাধা আছে। সবচেয়ে বড় বাধা অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লেখকের অভাব। প্রত্যেক ভাষায় নানা বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের বই লেখার মতো উপযুক্ত লেখক পাওয়া যাবে না। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় রেফারেন্স ও অন্যান্য তথ্যমূলক বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি বা 'মাস্টার কপি' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ইংরেজীতে লেখানো। ইংরেজী কপি থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হবে। আঞ্চলিক প্রয়োজনে সামান্য অদল-বদল করা যেতে পারে। মূল ইংরেজী পাণ্ডুলিপিটিও ছাপানো যায়। বিদেশে ভারতের উপর বইয়ের খুব চাহিদা আছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে পুস্তক উৎপাদনের ব্যয় কম হবে, পুস্তকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং সকল ভাষার পুস্তকেরই মান হবে প্রায় এক রকম।

ইংরেজী বিদায় দেবার প্রস্তাবের অন্তরালে যে কী বিরাট সমস্যা রয়েছে উপরে তার আভাস মাত্র দেওয়া হল। সমস্যা বিচার করতে গিয়ে আমরা বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দেখেছি। জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের সযত্ন রচিত পরিকল্পনা কার্যকর হলে ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

# আমাদের পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্যপুস্তক ছাড়া লেখা-পড়া সম্ভব, আজকাল একথা আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষে পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন বেশী দিন হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইংরেজদের চেষ্টায় নিয়মিতভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজনে অধ্যাপকরা নানা বিষয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কাজ এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, অধ্যাপকদের অবসর সময়ের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা চলল না। পৃথকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিল। তার ফলেই ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী সস্তা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিছু সংখ্যক পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণও করা হত। সমিতির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তদানীন্তন সরকার। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ভারতে সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত ভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ভ করেন।

এর পূর্বে শিক্ষার্থীর উপযোগী বই রচিত হত না। মূল গ্রন্থ আচার্য সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। পুথির সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। নকল করবার অনুমতি পাওয়াও কঠিন ছিল। অনেক আচার্যই ছিলেন বিদ্যার পুঁজিপতি। পুথি যথেচ্ছভাবে নকল করবার অনুমতি দিলে জ্ঞান অবাধে ছড়িয়ে পড়বে ; আচার্যদের মর্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা। তাই আচার্য মুখে মুখে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের পূর্বে কান ছিল শিক্ষা অর্জনের প্রধান ইন্দ্রিয় ; এখন হয়েছে চোখ। আচার্যের ব্যাখ্যা শুনে ছাত্রকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হত এবং মনে রাখতে হত। এই জন্যই তখন মুখস্থের উপর জোর দেবার রীতি ছিল। এখনকার মতো সর্বদা হাতের কাছে বই থাকত না যে, দরকার হলেই দেখে নেওয়া যাবে।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের পর থেকে নানা ধরনের বই প্রকাশিত হতে লাগল। শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত বিভিন্ন বিষয়ের বই তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের মান নির্দিষ্ট করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। একই ইতিহাসের ক্লাসে হয়ত দশ জন ছাত্র দশখানি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যেত। শিক্ষক দশ জনকেই পৃথকভাবে পাঠ বুঝিয়ে দিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর পরীক্ষার মান নির্দিষ্ট হল। ব্যবহারিক

জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মূল্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একই মানের পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হল। শুধু মানের সমীকরণ নয়; কিভাবে উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যায়, তাও একটি বড় প্রশ্ন। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি পরীক্ষা করে পাঠ্যপুস্তকের উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ১০ই অক্টোবর কমিটি তাঁদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন। এই কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। প্রত্যেক প্রদেশে স্থায়ীভাবে টেক্সট বুক কমিটি গঠনের প্রস্তাবটা ছিল প্রধান সুপারিশ। বাংলা দেশে অবশ্য একটি কমিটি আগে থেকেই ছিল। ১৮৭৫ সালের ১৩ই অগাস্টের এক সরকারী প্রস্তাব অনুসারে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল "For the examination of educational text-books for the minor and vernacular scholarship course". এই কমিটিতে ছিলেন :

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সভাপতি
বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়
মিঃ এ, ডব্লু, গ্যারেট।

পাঠ্যপুস্তকের গুণাগুণ বিচারের জন্য এরূপ বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহীদের সহায়তায় কাজ আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও এতদিন যাবৎ টেক্সট বুক কমিটি যে কাজ করেছেন তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। জাতির জীবনে অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান অবস্থায় লেখক, শিক্ষক এবং প্রকাশক কেউ সন্তুষ্ট নন। শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ পরিতাপের বিষয় যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি।

এতদিনেও পাঠ্যপুস্তকের মান উল্লেখযোগ্যরূপে উন্নত না হবার কারণ কি? মান উন্নয়নের জন্য প্রকৃত চেষ্টার অভাবটাই প্রথম কারণ। ব্রিটিশ আমলে টেক্সট বুক কমিটি লক্ষ্য রাখত ব্রিটিশের স্বার্থবিরোধী কোন কথা যেন পাঠ্যপুস্তকে স্থান না পায়। উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কতকগুলি পূর্বশর্ত পালনের প্রয়োজন। সেদিকে শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি পড়েনি। পাঠ্যপুস্তক লিখতে বসে কেউ গবেষণা করতে পারে না। শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার ফলাফল হাতের কাছে থাকা চাই। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক লেখা হলে উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে।

যেমন ধরা যাক, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠের পুস্তক ; একটির সঙ্গে আর একটির প্রভেদ বড় একটা চোখে পড়ে না। এর জন্য লেখককে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো মানের অভাবে তাঁকে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। য়ুরোপ-আমেরিকায় শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করে শব্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের লেখক সেই তালিকা থেকে দেখতে পারেন সপ্তম শ্রেণীর জন্য কোন্ শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্যই বা কোন্ শব্দগুলি উপযোগী। আমাদের দেশে মাতৃভাষা পড়ানো সম্বন্ধে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। সাহিত্যপত্রের ভাষার মান সম্বন্ধে যদি বা একটু যত্ন নেওয়া হয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি পত্রের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের পক্ষে কঠিন ও নীরস হয়ে পড়ে। ইংরেজী পাঠের পুস্তক থর্নডাইক, ওয়েস্ট প্রভৃতি শিক্ষাবিদের সঙ্কলিত শব্দতালিকা অনুসরণ করে লিখিত হলেও ত্রুটি থেকে যায়। কারণ, এসব তালিকা সঙ্কলন করা হয়েছে ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা সে সব ছাত্রদের পরীক্ষা করে। আমাদের দেশের জন্য ভিন্ন তালিকা প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য দু'টি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। প্রথম সিলেবাস বা পাঠক্রম স্থির করতে হবে। তারপর সেই সিলেবাসকে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে ভাষায় রূপ দেওয়া চাই। দীর্ঘকালের সুপরিকল্পিত গবেষণা ছাড়া এ দু'টির একটি কাজকেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আজকাল শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার বুনিয়াদ যার উপর নির্ভর করে, সেই গবেষণার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

আমাদের বিদ্যালয়ের সিলেবাসের ত্রুটি এতই সুস্পষ্ট যে শিক্ষার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই তাঁদেরও তা চোখে পড়বে। পাঠ্যপুস্তকের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত না থাকার জন্যই সিলেবাস ত্রুটিপূর্ণ হয়। পাঠ্যপুস্তক পড়াবার উদ্দেশ্য কী? বিদ্যালয়ে কয়েক পাতা বাংলা পড়লে, কিংবা কণ্ঠস্থ করলেই কি বাংলা শেখা হবে? তা যদি না হয়, তাহলে কেন পড়ানো হয়? এ কথার উত্তর এই যে, শিক্ষক এমনভাবে পড়াবেন যে, ছাত্রের মনে সে বিষয় আরো পড়বার জন্য ঔৎসুক্য জাগবে, সে শিখবে কি করে সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয় পড়তে হয়। অঙ্কের বইয়ে অনুশীলনীর পূর্বে যেমন ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্য কষে-দেওয়া উদাহরণ থাকে, বিদ্যালয়ের পাঠও তেমনি। বিদ্যালয়ের বাইরে স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চা কি করে করতে হয় পাঠ্যপুস্তক পড়ানো তারই উদাহরণ।

এই মাপকাঠি দিয়ে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিচার করলে ত্রুটি ধরা পড়বে। বাংলা পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির গদ্য রচনা এবং কৃত্তিবাস থেকে কালিদাস রায় পর্যন্ত কবিদের কবিতা এখানে স্থান পায়। কোনো কোনো সঙ্কলক তাঁদের নির্বাচনকে আরো আধুনিক কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন। সমস্ত বইটি উল্টে-পাল্টে ধারণা জন্মে এটি যেন বাংলা এম-এ সিলেবাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বাংলা সাহিত্যের সকল প্রসিদ্ধ লেখক তাঁদের বিচিত্র রচনার নমুনা নিয়ে এখানে উপস্থিত। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্যের এই বৃহৎ পরিধি এবং বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। বিভিন্ন রচনাশৈলীর জগা-খিচুড়ি বর্তমান বাংলা সাহিত্য স্বাধীনভাবে পড়ে বুঝতে সাহায্য করে না। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের রচনায় যে বাংলা পড়ানো হয় বিদ্যালয়ের বাইরে সংবাদপত্র, সাহিত্যপত্র এবং আধুনিক লেখকদের ভাষা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কর্তৃক সঙ্কলিত বহুল প্রচারিত অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে 'চলতি' ভাষায় রচনার একটি নিদর্শনও দেওয়া হয়নি। এভাবে বাংলা পড়ানোর ফলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিই হচ্ছে। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে একটি রচনাশৈলী থাকে। ডিকেন্সের রচনা থেকে একটি অংশ দিলেও ভাষা মার্জনা করে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করেন যে, লেখকদের সামান্যই স্বাধীনতা থাকে। ইংলণ্ডে একটা বিষয় পড়াবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং সেভাবে বইও লেখা হয়। কিন্তু এখানে লেখকদের হাত-পা বাঁধা। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে কিছু করবার নেই। পড়ানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। সিলেবাস অপরিবর্তনীয় না হলে উৎসাহী বিচক্ষণ শিক্ষকরা শিক্ষণবিদ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেতেন এবং এই অভিজ্ঞতা পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করতে সাহায্য করত।

শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশে বিশেষজ্ঞ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অভাবটাও উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক রচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। য়ুরোপ-আমেরিকায় 'এডুকেশানেল পাবলিশাস'দের শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট দান রয়েছে। আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তক মনোনয়নের প্রথাটা অত্যন্ত অনিশ্চিত। তথ্য ও ভাষার ভুলে কণ্টকিত বই অনুমোদিত হয়ে বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে দেখেছি। আবার আপাতঃদৃষ্টিতে ভালো মনে হয়েছে, এমন বইও বাতিল হয়ে যায়। মনোনয়নের ব্যাপারটাকে তাই

অনিশ্চিত লটারীর মতো মনে হয়। সম্ভ্রান্ত প্রকাশকদের অনেকে সেজন্য পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাট্‌কাবাজ প্রকাশকদের নিকট পাণ্ডুলিপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিতে হয় বলে লেখকরা পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করবার জন্য পরিশ্রম করতে উৎসাহ বোধ করেন না।

আমাদের বিদ্যালয়ের সিলেবাসে দেখতে পাই তথ্য ও নীতি শেখাবার ঝোঁক। সাহিত্যপত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। অথচ প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভাষা শিক্ষা। ভাষাজ্ঞান জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র। স্বাধীনভাবে পড়ে বোঝবার ক্ষমতা জন্মালে যে কোনো বিষয় আয়ত্ত করা সহজ হয়। আমাদের দেশে যত ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তার এক সামান্য অংশ বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করবার সুযোগ পায়। বেশীর ভাগ ছাত্র কিছুদূর পড়ে ঘরে ফিরে যায়। সেই সঙ্গে যদি ভাষার মোটামুটি জ্ঞানটা নিয়ে যেতে পারে তাহলে পুনরায় নিরক্ষরতায় ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে না।

কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন যে, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করলে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হবে বলে আশা করা যায়। এ আশা পূর্ণ হবে বলে ভরসা করা চলে না। সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা শিক্ষার মানকে প্রভাবান্বিত করবার মতো সাফল্য লাভ করেনি। লাল ফিতার পরিবেশ নিরন্তর নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুকূল নয়। গভর্নমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করে শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষণের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে, যাঁরা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত, পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার তাঁদের উপরেই থাক। সোভিয়েট রাশিয়ার সবকিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত। সেখানেও পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব একটি দপ্তরের উপরে থাকে না। শিক্ষাবিজ্ঞান অ্যাকাডেমির (Academy of Educational Sciences) গবেষকরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা দপ্তরের উপর নির্ভর না করে শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের সমবেত চেষ্টায় পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়। প্রথম পাঠ রচনার বেলাতেও এই যত্নের ত্রুটি হয় না।

পাঠ্যপুস্তকের গুণ বিচারের প্রধান মাপকাঠি এই তিনটি : (১) লেখকের বিশেষ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ; (২) পুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং উপযুক্ত কোনো শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে

বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে কি না; (৩) পুস্তকের ছাপা, ছবি, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি।

লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিচার করবার সময় আমরা বিদ্যালয়ে পড়ানোর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কি না, তা ভেবে দেখি না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপক বই লিখলে সমাদর হবে; উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র পড়াবার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও কিছু যায় আসে না। পুস্তক মনোনয়নের জন্য যে বিচারক সভা গঠিত হয় তার মধ্যেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই প্রাধান্য লাভ করে থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই তাঁদের পুস্তক শিক্ষার মান কতটুকু উন্নত করতে পারে তা ভাববার বিষয়। যোগ্য শিক্ষকরা উপযুক্ত মর্যাদা না পেয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এজন্যই আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পড়াবার নিজস্ব পদ্ধতি কদাচিৎ দেখা যায়। একই বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে শেখানো চলে। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে একমাত্র শিক্ষকরাই ওয়াকিব-হাল হতে পারেন এবং তাঁদের পড়াবার বিশিষ্ট রীতি অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনাও শিক্ষকদের পক্ষেই সম্ভব।

বাংলা বই-এর মুদ্রণ-পারিপাট্য এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যে, প্রকাশকরা যত্নবান হলে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের চোখের পক্ষে স্বাস্থ্যকর করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু লাভের অংশ বাড়াবার জন্য তাঁরা তা করেন না। প্রকাশকরা মনোনয়নের জন্য যখন বই দেন তখন তার ছাপা, কাগজ ইত্যাদির মান যথাসম্ভব ভালো করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু পুস্তক মনোনীত হয়ে গেলে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যগ্রতায় সেই মানকে নিচু করতে বাধে না।

১৮৭৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঠ্যপুস্তক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে কৃষ্ণদাস পাল যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজকের দিনেও সত্য। তিনি বলেছিলেন:

"So long as the position of the teachers are not raised it would be hopeless to expect an improvement in the quality of teaching and without such improvement all labour in the production of good school-books would be practically thrown away."

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না হলে ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টা বৃথা। সত্যিকার ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনায় শিক্ষকরাই সবচেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করবেন।

কারণ তাঁদের মতো বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত আর কে আছে? কিন্তু এর জন্য শিক্ষকদের ভদ্রভাবে জীবন ধারণের মতো আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা করা চাই। নিজেদের বৃত্তি সম্বন্ধে গৌরববোধ থাকাও প্রয়োজন; তা না হলে কোনো ভালো কাজ করা যায় না। গৌরববোধ জাগবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

সরকারী দপ্তর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পক্ষে কাগজে-কলমে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্ভব হলেও তাকে ফলদায়ী করবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকের পৃথক মূল্য কিছু নেই, পড়ানোর পদ্ধতির উপরেই তার মূল্য। পুস্তকের পাঠ শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে আরো পড়বার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, উপযুক্ত শিক্ষক তা দেখবেন। ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং ভালো করে পড়ানো পরস্পর নির্ভরশীল। একটিকে অবহেলা করলে আর একটির উদ্দেশ্য সফল হবে না। অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের পাঠ্যপুস্তকও ভালো শিক্ষকের গুণে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু অসন্তুষ্ট, অভাবগ্রস্ত শিক্ষকের হাতে পড়লে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকও ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা। ভালো পাঠ্যপুস্তক নেবানো টর্চের মতো। উপযুক্ত শিক্ষকের স্পর্শে তা জ্ঞানের প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠতে পারে। কিন্তু সে স্পর্শ জীবন্ত হওয়া চাই।

# অশ্লীলতা-নিবারক আইন

সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রশ্ন উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে পাঠক ও সমালোচকদের বিশেষরূপে ভাবিয়ে তুলতে শুরু করেছে। হাতে-লেখা পুথির যুগে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সমস্যা নিয়ে তেমন করে কেউ ভাবেনি। নকল করা কষ্টসাধ্য ছিল বলে ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য বইয়ের প্রচার ছিল একান্ত সীমিত। তখন পাঠকের সংখ্যা ছিল নগণ্য, অধিকাংশ ছিল শ্রোতা। শুধু পাঠ শুনে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার অপেক্ষাকৃত কঠিন। হাতের কাছে বই থাকলে বার বার পড়ে এবং পারম্পর্য বিবেচনা করে বিচার করা সহজ হয়। তাই মুদ্রণ-পূর্ব যুগের সাহিত্যে এমন অনেক বই বা রচনাংশ পাওয়া যায় যা একালে লেখা হলে নিষিদ্ধ করা হত। ধর্মগ্রন্থ অথবা ক্লাসিক্‌সের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বলেই এদের মধ্যে অনেক গ্রন্থের প্রচার অব্যাহত আছে।

মুদ্রণশিল্পের উন্নতির পর দেখা গেল এই আবিষ্কার অবিমিশ্র মঙ্গলের কারণ হয়নি। কল্যাণকর গ্রন্থের সঙ্গে এমন অনেক বই ছাপা হতে লাগল যাদের প্রচার সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মধ্যযুগ পর্যন্ত ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কিত মতামতের উপরই সেন্সরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কারণ, রাজা ও গির্জার প্রভুত্ব বিরূপ সমালোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা ছিল। সাধারণ লোকের ভালো মন্দ নিয়ে ভাববার সময় তখনো আসেনি। তা ছাড়া রাজশক্তি বা গির্জার প্রভুত্বের উপর আঘাত হানতে একটি-দু'টি বই-ই যথেষ্ট। কারণ, এই জাতীয় বই প্রধানত একটি আইডিয়া প্রচার করে। সূর্য চোখে না দেখলেও যেমন তার আলোর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, তেমনি একটি ভাবাদর্শ ধীরে ধীরে সমাজে আপনি প্রচার লাভ করতে থাকে ; মূল বইটি খুব কম লোকে পড়লেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

কিন্তু নৈতিক প্রশ্ন আলাদা। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বই মূলত কোনো আদর্শ প্রচারের জন্য লেখা হয় না। জীবনের একাংশের যে ছবি থাকে তাকে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে তুলে নিয়ে প্রচার করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের আবেদন ( তা ভালো মন্দ যা-ই হোক না কেন ) পড়ে উপলব্ধি করার মধ্যে। সুতরাং ছাপাখানা যতদিন প্রচুর সংখ্যক বই ছাপিয়ে অনেক পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়নি ততদিন সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে সমাজ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এ

থেকে ধারণা করলে ভুল হবে যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে এর পূর্ব পর্যন্ত সমাজ উদাসীন ছিল। সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে সচেতন হবার পূর্বে রঙ্গমঞ্চের অশ্লীলতা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে আইন হয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের অনেক দেশে। ব্রিটেনে অশ্লীল পুথিপত্রের বিরুদ্ধে আইন পাশ হয় ১৮৫৭ সালে। এর পূর্বে য়ুরোপ বা আমেরিকায় এ ধরনের কোনো আইন ছিল না। অশ্লীল সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করত চার্চের কর্তৃপক্ষ।

যতদূর জানা যায় তা থেকে মনে হয়, ভারতেই সর্বপ্রথম অশ্লীল সাহিত্য প্রচার বন্ধের জন্য একটি পৃথক আইন করা হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নমেণ্ট "অব্‌সীন বুক্‌স্‌ অ্যাণ্ড পিক্‌চার্স অ্যাক্ট" পাশ করেন। এ দেশের জনমত অশ্লীল সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের পূর্বেই সচেতন হয়েছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তা আজকের সমস্যা থেকে পৃথক। তখন সাহিত্যে অশ্লীলতা ছিল ব্যবসায়ের পণ্য। এখন রসসৃষ্টি ও অশ্লীলতার অপবাদ প্রায়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে; পৃথক করে বিচার করতে গেলেই সমস্যা দেখা দেয়।

ভারতে অশ্লীল পুথিপত্রের প্রচার বন্ধের জন্য আইন সহজে হয়নি। তার জন্য অনেকদিন আন্দোলন করতে হয়েছে।

মুসলমান আমলের শেষ ভাগে ফার্সী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে। ভারতচন্দ্রের রচনায় এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁর কুটনী চরিত্র সগৌরবে দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। পাঁচালিকার ও কবিওয়ালারা তার সুযোগ গ্রহণ করেছে। মানবচরিত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এল। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় তখন প্রেস হয়েছে। কোনো কোনো প্রেসের মালিক অশ্লীল বই ছাপিয়ে ব্যবসা শুরু করল। কলকাতার পথে-ঘাটে সর্বত্র ফেরিওয়ালারা ঘুরে ঘুরে এ সব বই বিক্রি করত। সমকালীন বিবরণী ইত্যাদি থেকে দেখা যায় যে এ জাতীয় বই আট দশ হাজার কপি করে ছাপা হত। প্রতি কপির দাম ছিল সাধারণত চার আনা। সংস্করণ শেষ হতে বেশী সময় লাগত না। লাভ হত প্রচুর। সে সময়ে প্রকাশক ও মুদ্রকের ভূমিকা ছিল অভিন্ন। বই বিক্রি হত ছাপাখানা থেকে; অথবা ছাপাখানা থেকে বই নিয়ে ফেরিওয়ালারা শহরের পথে পথে ঘুরে বিক্রি করত। সুতরাং বই বিক্রির প্রায় সম্পূর্ণ লাভটাই ছিল ছাপাখানার মালিকের প্রাপ্য। এই সহজ পথে প্রচুর আয়ের প্রলোভন অনেককেই আকৃষ্ট করল। তার

ফলে অসংখ্য অশ্লীল পুথিপত্র প্রকাশিত হয়ে কলকাতার বাঙালী সমাজে অবাধে প্রচারিত হতে লাগল।

ছাপাখানার মালিকরা সকলেই ছিল ভারতীয়। অধিকাংশ অশ্লীল বই ছাপা হত বাংলা ভাষায়। বাংলা বইগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: (১) কাম-শাস্ত্র জাতীয় সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ; (২) বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী; (৩) যৌন আবেদনমূলক রাধা-কৃষ্ণের লীলা কাহিনী; (৪) ফার্সী সাহিত্যের অশ্লীল গল্পের অনুবাদ; (৫) মৌলিক অশ্লীল রচনা।

পাঠকদের আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে অনুবাদকরা প্রায়ই নতুন বিষয় যোগ করত। যৌন আবেদনের উপর জোর দেওয়াই ছিল অনুবাদকের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য এ সব রচনার সাহিত্যিক মূল্য ছিল না।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে কলকাতার পত্রিকায় অশ্লীল পুথিপত্র প্রচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এ দেশে মুদ্রিত বই ছাড়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড থেকে অশ্লীল ছবি আমদানি করে কলকাতার পথে পথে ফেরিওয়ালারা বিক্রি করত। আমদানি বন্ধ করবার মতো আইন না থাকায় কাস্টমস বিভাগ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি।

অশ্লীল ছবি ও পুথিপত্রের অবাধ প্রচার সমাজকে দ্রুত নৈতিক অধোগতির পথে নিয়ে চলছিল। কোনো কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গভর্নমেণ্টকে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য অনুরোধ করা হল। কঠোর দণ্ডের ভয়ে অশ্লীল বই বা ছবি বিক্রি কমে যাবে। এর জন্য আইন প্রয়োজন। অবশ্য শুধু আইনের সাহায্যে অশ্লীল বই ও ছবির ব্যবসা একেবারে বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু সমাজসেবীদের পক্ষে আইনটি দুর্নীতি প্রচারের বিরুদ্ধে হবে প্রধান সহায়।

আইন প্রণয়নের দাবি ওঠবার পর কাউন্সিলের কোনো কোনো সভ্য সমস্যা সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হলেন। তথাপি সমস্যাটি যে এত গভীর ও ব্যাপক তা তাঁরা স্বীকার করলেন না। তাঁরা বললেন, যদি সমস্যাটি সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে পূর্বে সরকারের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি কেন আকৃষ্ট করা হয়নি?

এই অভিযোগ সত্য নয়। অশ্লীল পুথিপত্রের প্রচার সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯ '২০) পূর্ববর্তী পনেরো বছরে দেশীয় ছাপাখানায় যে-সব বই ছাপা হয়েছে তাদের বিষয়ে

একটি বিবরণী সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সময়কার বাংলা বই সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণীতে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করা হয়েছে :

"Not a few are distinguished only by the flagrant violation of common decency; and are too gross to admit of their attempts be disclosed before the public eye. The avidity with which these indecent publications are sought for and the general currency obtained for them, especially at the principal Hindu holiday, is deeply to be lamented as manifesting aloud the degraded state of those minds which will take such pleasure therein. Most of...the works are extracted from the Pooranas···; and by some Pundits these last works are declared by themselves so gross as to be never to be tolerated by any respectable Hindus."

কলকাতার আঠারোজন ব্রাহ্মণ এবং এগারোজন কায়স্থ নাগরিক একটি বিবৃতি প্রচার করে অশ্লীল পুস্তকের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেছেন : "শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয়া লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রজ্ঞ হইয়া কামসংবর্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকের দিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।" সম্পূর্ণ বিবৃতিটি স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে ছাপা হয়েছে।

যে ধরনের বই তখন ছাপা হত স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে উদ্ধৃত বইয়ের নাম থেকে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে : বিদ্যাসুন্দর; রসমঞ্জরী; রতিমঞ্জরী; আদিরস; রসপদ্ধতি; শৃঙ্গারতিলক; কামশাস্ত্র; রতিকলা; রতিবিলাস ইত্যাদি। এসব বই গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্য-পদ্য মিশিয়ে লেখা হত।

স্কুল বুক সোসাইটির মন্তব্য সেদিন হয়ত কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে এমন অবস্থা হল যে এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। তথাপি সরকার পক্ষের অনেকের মনে তখনো আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে দ্বিধা ছিল। ব্রিটেনে এ ধরনের আইন হয়নি। বইয়ের প্রচার আইনের সাহায্যে বন্ধ করবার প্রস্তাব অন্যত্র ওঠেনি। সুতরাং এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আইন প্রণেতাদের মনে সন্দেহ ছিল।

কিন্তু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ক্রমাগত দাবিকে অগ্রাহ্য করতে না

পেরে গভর্নমেণ্ট ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি 'অবসীন বুক্স্ অ্যাণ্ড পিকচার্স অ্যাক্ট' পাশ করেন। ঐ বছরের এটি ছিল প্রথম আইন। আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, "যেহেতু অশ্লীল বই ও ছবির ক্রয়-বিক্রয় নৈতিক অধঃ-পতনের সহায়ক সেই হেতু এই ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল :

"Whoever, within the territories in the possession under the Government of the East India Company, any shop, bazar, street, thoroughfare, highroad, or other places of public resort, distributes, sells or offers or exposes for sale or wilfully exposes to public view, any obscene book, paper, print, drafting, painting, or representation ; or sings, recites, or utters any obscene song, ballad, or works to the annoyance of others ; shall, upon conviction,...be liable to a fine not exceeding hundred rupees, or to imprisonment with or without hard labour, for a period not exceeding three months, or to both."

অশ্লীল সাহিত্য প্রচার বন্ধের জন্য এই প্রথম রচিত আইনটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তবে, এর পৃথক অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। আইনের মূল ধারাগুলি পরিবর্তিত আকারে ভারতীয় পেনাল কোডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আইনের উদ্দেশ্য সফল হতে সময় লেগেছে। রেভারেণ্ড লঙ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের একটি বিবরণী সঙ্কলন করেছিলেন। তা থেকে দেখা যায় যে, আইন পাশ হবার পরের বৎসরও কলকাতায় ১৪,২৫০ কপি যৌন আবেদনমূলক বই ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া লঙ সাহেব এমন একটি সচিত্র অশ্লীল বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যার ত্রিশ হাজার কপি এক বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনজন মুদ্রাকরকে চার আনা মূল্যের তিনটি অশ্লীল বই বিক্রির জন্য প্রচলিত ফৌজদারী আইন অনুসারে পরীক্ষামূলক ভাবে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। জরিমানা ও মামলা পরিচালনায় আসামী পক্ষের মোট ব্যয় হয়েছিল ১,৩০০ টাকা। সে যুগে এত টাকার ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা চালাতে

পারে এমন মুদ্রাকরের সংখ্যা বেশী ছিল না। মামলায় জড়িয়ে পড়লে হয়ত সর্বস্ব খোয়াতে হবে এই আতঙ্ক ছোট ছাপাখানার মালিকদের অনেকটা সংযত করতে পেরেছিল। তথাপি আইন পাকা হবার বেশ কিছুকাল পর পর্যন্তও অশ্লীল বইয়ের ব্যবসা কলকাতায় ভালোই চলেছে। আইন হবার পূর্বে প্রকাশ্যে সর্বত্র এই শ্রেণীর বই ও ছবি বিক্রি হত। আইন পাশ হবার পর এ সব বিক্রি হত গোপনে। যেমন এখনও হয়।

বাংলা ভাষায় ভালো বই ছিল না বলেও অশ্লীল বই প্রচারের সুযোগ পেয়েছে। বাংলায় ভালো গল্প-উপন্যাস এবং বিভিন্ন বিষয়ের বই প্রকাশিত হতে শুরু হবার পর থেকে অশ্লীল রচনার আকর্ষণ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভিক্টোরিয়ান নৈতিক আদর্শ এ দেশের সমাজকেও প্রভাবান্বিত করেছে। সুতরাং আইনটির যথেষ্ট মূল্য থাকলেও ভালো বাংলা বইয়ের রচনা ও প্রচার এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসার অশ্লীল বইয়ের ব্যবসা বন্ধ করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

# রবীন্দ্র-রচনার সমকালীন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যের আবেদন স্বদেশের গণ্ডির মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সকল দেশের পাঠকের নিকটই তাঁর রচনা সমাদৃত হবার যোগ্য। এই বিশেষ গুণটির স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যের প্রধান প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই সব ধারা তাঁকে কতটুকু প্রভাবান্বিত করেছে, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা বুঝতে হলে বিশ্ব-সাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দেখতে হবে। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন বইয়ের সঙ্গে অন্য কোনো লেখকের বইয়ের তুলনামূলক আলোচনার কথা বলছি না। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' যখন প্রকাশিত হয় তখন বিশ্বের কাব্য-সাহিত্যে কি কি ধারা প্রচলিত ছিল, উল্লেখযোগ্য কোন্ কোন্ কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, তার আভাস পেলে 'গীতাঞ্জলি'কে বিশ্বের সাহিত্য-ভাণ্ডারের অংশ হিসাবে দেখবার সুযোগ পাব। সাধারণত আমরা দেখি বিচ্ছিন্ন ভাবে, এক একটি বইকে আলাদা করে। সামগ্রিক ভাবে দেখতে হলে বিশ্ব-সাহিত্যের মানচিত্র পাঠকের সহায়ক হবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের নিকট সাহিত্য সঙ্কীর্ণ হয়ে শুধু পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর সঙ্গত কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন; কিন্তু সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব তাঁর উপর সামান্যই পড়েছে। ইকবাল, প্রেমচাঁদ, ভারতী, ভাল্লাথোল, ভাই বীর সিং প্রভৃতি লেখকদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কিছু গ্রহণ করবার ছিল না। আর এঁরা তাঁর অনুবর্তী; তিনি পথ রচনা করেছেন, অন্য লেখকরা সেই পথে এসেছেন। ডঃ কুনহান রাজা মালয়ালাম সাহিত্যের আধুনিক যুগ সম্বন্ধে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে তাঁর রচনার প্রতি মালয়ালী লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এবং "this was the turning point in the history of contemporary Malayalam poetry." কম-বেশী সকল ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কেই এ কথা সত্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আঞ্চলিক সাহিত্যগুলিতে নবযুগের সূচনা হয়েছে।

চীন-জাপানের আধুনিক সাহিত্য থেকেও রবীন্দ্রনাথের কিছু নেবার ছিল না। তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রথমার্ধে চীন-জাপানের সাহিত্যে এমন কোনো নতুন ধারা

প্রচলিত ছিল না কিংবা এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়নি যা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান লেখককে প্রেরণা দিতে পারে। তা ছাড়া, মুসলমান আমল থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রধানত পাশ্চাত্ত্যমুখী হয়ে পড়ে; কেননা, আমাদের শাসকরা এসেছে পশ্চিম থেকে। প্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ভারত পরাধীন হবার পর। তাই চীন-জাপানের আধুনিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকলেও তার প্রতিধ্বনি এ দেশে পৌঁছবার পথ ছিল একান্তই সঙ্কীর্ণ।

ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজী সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টাদের গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের নবযুগ শুরু হয়েছে ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রেরণায়। পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য দেশের ভাবধারাও আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একমাত্র ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের মাধ্যমেই পেয়েছি। সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যই ছিল তখন আমাদের একমাত্র জানালা যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ভাবধারা এসে পৌঁছত। ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটেছে ভিক্টোরিয়ান যুগের পরোক্ষ প্রভাবের পরিবেশে। বাংলা দেশের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে অলক্ষ্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রভাব স্বাভাবিকরূপেই পড়েছিল; রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক লেখকদের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য নিবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নতুন করে আমাদের পরিচয়ও হল স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতদের সাধনার ফলে। সুতরাং বাংলার নবজাগরণের মূলে ভিক্টোরিয়ান মানসিকতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ভিক্টোরিয়ান যুগকে শুধু একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে ইংরেজী সাহিত্যে নানা ধারা ও উপধারা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মেকলে, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, টেনিসন, ব্রাউনিং, রসেটি, আর্নল্ড, সুইনবার্ন, মেরিডিথ প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন প্রকৃতির লেখকদের আবির্ভাব হয়েছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের নাম শুনলেই যে বৈশিষ্ট্যের কথা সকলেরই প্রথম মনে পড়ে তা হল এর সঙ্কীর্ণ নৈতিক আদর্শ। সাহিত্য ও সামাজিক জীবন এই সঙ্কীর্ণ নীতিবোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত হল এবং কোথাও সামান্য একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই অশ্লীলতার অভিযোগ উঠত।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা নিয়ে এমন অহেতুক বাড়াবাড়ি ছিল না। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যে-সব লেখক আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি

করেছেন নর-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁদের রুচিবোধ পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আসেনি, এসেছে ইংলণ্ড থেকে।

ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমাজসচেতনতা। পূর্ববর্তী সাহিত্যে সমাজচিন্তা এতটা প্রাধান্য লাভ করেনি। ভিক্টোরিয়া শাসন-ভার গ্রহণ করবার পূর্বে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট রিফর্ম বিল উত্থাপিত হয়। এটি আইনে পরিণত হবার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে এবং অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বও স্বীকৃত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস প্রথা রহিত করা হয়। ফ্রী ট্রেড নীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগের বছর ইহুদীরা সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হবার অধিকার লাভ করে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যালটের সাহায্যে ভোট দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকার, মেয়েদের পুরুষের মতো সকল বিষয়ে সমান অধিকার ইত্যাদি দাবি নিয়ে ভিক্টোরিয়ান আমলে প্রচণ্ড আন্দোলন চলেছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের সমাজচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি ছিল জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদ,—যার মূল কথা হল 'the greatest happiness of the greatest number.'

ভিক্টোরিয়ান যুগে বিজ্ঞান মানুষের জীবনের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। নতুন আবিষ্কারের ফলে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে ; বাষ্প ও বিদ্যুৎ-এর সাহায্যে কলকারখানা এবং যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয় ; রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত, মোটর গাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দূরকে নিকট করল। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ না করবার নীতি গ্রহণ করবার ফলে কলকারখানা ও জমির মালিকরা শ্রমিকদের উপর নানাবিধ নির্যাতন করত। আর্থিক উন্নতির ফলে বিলাসের উপকরণ নিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী মত্ত হয়ে উঠল। আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে মালিকদের শোষণ ক্রমশঃ নির্মম হতে লাগল। আত্মার অবমাননা করে ঐহিক সুখ ও সম্পদের প্রতি এই দুর্দমনীয় লোভ দেখে কার্লাইল, রাস্কিন প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। মধ্যযুগের ধর্মশাসিত জীবন তাঁদের নিকট বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে হল। সমসাময়িক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রসেটি ও মরিসের নেতৃত্বে প্রি-রাফায়েলাইট ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগের কবি ও শিল্পীরা ছিলেন এঁদের আদর্শ।

ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ চিন্তার ক্ষেত্রে নিয়ে এল অভূতপূর্ব বিপ্লব। নিজেকে

নিয়ে মানুষের যে গৌরব ছিল তা গেল দূর হয়ে। আর, সব চেয়ে বড় কথা, বাইবেলের উপর অবিচল আস্থা ডারুইনের তত্ত্বের আঘাতে গেল শিথিল হয়ে। অনেক লেখকের রচনায় সংশয় দেখা দিল। ম্যাথু আর্নল্ড তাঁদের মধ্যে একজন।

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ভিক্টোরিয়ান যুগের এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি অদৃশ্যভাবে আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে এসে প্রবেশ করেছে। আর পেয়েছি বিজ্ঞানের দান—রেলপথ, টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী, স্টীমার, কলকারখানা প্রভৃতি। ইংরেজী শিক্ষার পরিবেশে যাঁরা মানুষ হয়েছেন সেদিন তাঁদের পক্ষে ভিক্টোরিয়ান চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকরা ভারতীয় সংস্কৃতির জারক রসের সাহায্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের চিন্তার দানকে আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন। সেখানেই তাঁদের কৃতিত্ব। যখন আমাদের সমকালীন জীবনে ছিল সম্পদের দীনতা, তখন দেশীয় সংস্কৃতির নোঙর ছিঁড়ে ভেসে যাওয়া ছিল সহজ। অথচ তা হয়নি। বরং বিংশ শতকের সাহিত্যে স্বদেশের বিশিষ্ট ছাপটি যেন অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবতার আবির্ভাব। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে রোমান্টিসিজমের সর্বব্যাপী প্রভাব শিথিল হয়ে এল। রোমান্টিকতা সাহিত্য থেকে একেবারে বিদায় কখনও নেয়নি এবং কখনও নেবেও না। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বাস্তবতা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করতে আরম্ভ করল। এর উল্লেখযোগ্য সূত্রপাত ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁদালের 'লাল-কালো' (১৮৩০) উপন্যাসে। বাস্তবতা আর এক ধাপ অগ্রসর হয় বালজাকের হিউম্যান কমেডি সিরিজের চব্বিশটি উপন্যাসে। সমসাময়িক ফরাসী জীবনের চিত্র এই সিরিজের উপন্যাসগুলিতে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু ফ্লোবেয়ারের 'মাদাম বোভারি'-তে (১৮৫৭) আমরা সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনের সুন্দর শিল্পরূপ পাই। বাস্তবতাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন রাশিয়ার তিন জন ঔপন্যাসিক—দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনিভ এবং তলস্তয়। তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' এবং 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বাস্তবতামূলক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নাটকে বাস্তবতা আনলেন নরওয়ের ইবসেন। মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা ও আনন্দ বেদনা তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। ইংরেজী নাটকে বাস্তবতা আনলেন বার্নার্ড শ'। তাঁর রচনায় ইবসেনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

১৮৭১ সালে বাস্তবতামূলক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন বাঁক সৃষ্টি হল। ঐ বছর জোলার Rougon-Macquart সিরিজের প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত

হয়। রুগোঁ-মাকার পরিবারের ইতিহাস রচনায় জোলা অতিবাস্তব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন Hippolyte Taine-এর প্রেরণায়। অতিবাস্তবতা বা Naturalism হল "A manner of literary composition distinguished by an emphasized realism and calculated to present actuality, a detached, scientific objectivity, a wide inclusiveness of details, a freedom of subject-matter, and a treatment of the natural man in any or all his strengths and weaknesses." সমাজের নীচুতলার ( এবং সাধারণতঃ পতিত ও অবহেলিত ) নরনারী অতিবাস্তববাদী লেখকদের নায়ক-নায়িকা। বৈজ্ঞানিক যেমন ল্যাবরেটরিতে বস্তুর গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা করেন, অতিবাস্তববাদী লেখকরাও তেমনি সমাজের ল্যাবরেটরিতে পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষা করেন। জার্মান লেখক Gerhart Hauptmann এবং ইতালীয়ান লেখক Giovanni Verga অতিবাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে মূল য়ুরোপীয় ভূখণ্ডের সাহিত্যের মতো বাস্তবতা ও অতিবাস্তবতা প্রাধান্য লাভ করেনি। ডিকেন্স ও থ্যাকারের সমসাময়িক সমাজচিত্রে বাস্তবরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অতিবাস্তবতার লক্ষণ টমাস হার্ডির কোনো কোনো উপন্যাসে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এডগার আলান পো'র কবিতা ও গল্পে উনবিংশ শতকের আর একটি ধারার সূচনা হয়। এই ধারার লেখকরা decadent বা অবক্ষয়ধর্মী। বোদলেয়ার, ভার্লেন, র‍্যাঁবো প্রভৃতি ফরাসী লেখকরা অবক্ষয়ধর্মী। আর্থার সিমন্স বলেছেন, অবক্ষয়ধর্মী লেখকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল "an intense self-consciousness, a restless curiosity in research, an oversubtilizing refinement upon refinement, a spiritual and moral perversity." ইংরেজী সাহিত্যে এই দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন অস্কার ওয়াইল্ড।

বাস্তববাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রি-রাফায়েলাইট ব্রাদারহুড মধ্যযুগের আদর্শ সামনে রেখে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। Charles Leconte de Lisle-এর নেতৃত্বে Parnassian কবিগোষ্ঠী ফ্রান্সের কাব্যসাহিত্যে নতুন সাড়া জাগালেন উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে। এ দলের কবিরা "opposed the excessive emotionalism and subjectivism of romanticism and aimed at 'Olympian calm' in attitude and

meticulous precision in technique." কোনো কোনো সমালোচকের মতে এই কাব্য-আন্দোলন হল "the result of the influence of the growing 19th-century scientific and historical objectivity in poetry."

উনবিংশ শতকের য়ুরোপীয় কাব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল সিম্বলিজম। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিম্বলিস্ট কবিদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী করে অনুভূত হয়েছিল। মালার্মে ছিলেন এঁদের নেতা এবং সিম্বলিস্ট তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। সিম্বলিজম "sought to achieve in poetry the effects of music, making use of clustered images and metaphors suggesting or symbolizing the basic idea or emotion of each poem." বোদ্‌লেয়ার, র‍্যাঁবো, ভার্লেন প্রভৃতি কবিদের রচনাতেও সিম্বলিজমের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। মেতারলিঙ্কের নাটকে সিম্বলিস্ট রচনারীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিদের প্রভাব বর্তমান শতকেও দেখতে পাই। ইয়েট্‌স, এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার, রিল্‌কে প্রভৃতি কবিরা সিম্বলিজমের আদর্শ দ্বারা কম-বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিট্যাল' প্রকাশিত হয় (১৮৬৭-১৮৯৫) উনিশ শতকে। সকল দেশের সাহিত্যের উপরেই মার্ক্সবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পরবর্তী শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে তা ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। মার্ক্সবাদ রাশিয়ান সাহিত্যে বিস্ময়কর রূপান্তর এনেছে। অন্যান্য দেশের বহু শক্তিশালী লেখক এই তত্ত্বকে স্বীকার করে জীবন, সমাজ ও নর-নারীকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছেন।

বর্তমান শতকের সাহিত্যে পূর্ববর্তী শতাব্দীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। টমাস মান, সমারসেট মম্‌, আইভান বুনিন প্রভৃতি লেখকদের মধ্যে বাস্তবতার ধারাটি দেখতে পাই ; অতিবাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে জুল রোমাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, থিওডোর ড্রেইজার, হেমিংওয়ে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। একটি অঞ্চলের জীবন ও সমাজের বাস্তব চিত্রকর হিসাবে ক্নুট হামসুন, সেলমা লাগেরলফ, উইলিয়ম ফকনারের নাম উল্লেখ করতে হয়।

বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্তমান শতকের প্রথম দিকে আমরা নিও-রোমান্টিক লেখক লেওনিদ আঁদ্রেয়েভ, দান্নুনৎসিও, কিপলিং, কনরাড, লোটি এবং অন্যান্য লেখকদের রচনা পাই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হল মনের

জগতে সাহিত্যের প্রসার। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। মার্ক্সবাদ অপেক্ষাও গভীররূপে ফ্রয়েডের মতবাদ এই শতকের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। মোরাভিয়া, লরেন্স, প্রুস্ত, জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ এবং আরও অনেকে আমাদের মনের জগৎকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনায় এক্সপ্রেশানিজম রীতির সফল প্রয়োগ প্রথম দেখা যায়। কারেল চাপেক, ইউজীন ও'নীল, কাফকা, লরকা প্রমুখ লেখকরা এই রীতি বহুলাংশে গ্রহণ করেছেন। এই রীতিটিও এসেছে বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে; তাই এর উদ্দেশ্য হল "to present an intellectual abstraction of nature, to give emphasis to some quality inherent in the object, rather than by a desire to present normal external aspects of nature."

বর্তমান জড়বাদী সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, আলডুস হাক্সলি, পল ক্লদেল প্রমুখ লেখকরা তাঁদের রচনায় ধর্মের উপর জোর দিয়েছেন; রোমাঁ রোলাঁ, আনাতোল ফ্রান্স, বার্ণার্ড শ', এচ্. জি. ওয়েলস প্রভৃতি চিন্তাশীল এবং উদারমতাবলম্বী লেখকরা প্রচার করেছেন মানবতাবাদ; আবার জিদ, পিরান্দেল্লো, সারত্র্ জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন সম্বন্ধবাদ ও অস্তিত্ববাদের দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে।

বর্তমান শতকের প্রধান ঘটনা দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের আঘাতে বিগত শতকের আদর্শবাদের ভিত্তি টলে উঠেছে। জীবন সম্বন্ধে এসেছে অনিশ্চয়তা। সাহিত্যে এই দু'টি যুদ্ধেরই প্রভাব পড়েছে। সে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং নীতিবোধের শৈথিল্য থেকে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছু কাল পূর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ধারাগুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। অনেক ধারা এবং উপধারার নাম উল্লেখ করাও সম্ভব হয়নি। বাংলা সাহিত্যে এর কোনো একটি ধারা প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে রোমান্টিসিজম, রিয়ালিজম প্রভৃতি আমরা একই সঙ্গে পেয়েছি। যে পরিবেশে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিবর্তন হয়েছে এ দেশে তা ছিল না। আমরা বিজ্ঞানের দান গ্রহণ করেছি তার জন্য সাধনা না করেই। য়ুরোপীয় মূল ভূখণ্ডের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে; রক্ষণশীল ইংরেজ পাঠক ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগের পূর্বে বালজাক, ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ প্রভৃতি লেখকের রচনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট

হয়নি। স্কুল-কলেজে আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। সুতরাং য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি অনেক পরে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির ধারা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণভাবে স্পর্শ করেছে। কিন্তু নিজের প্রতিভা দ্বারা তিনি তা আত্মস্থ করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের কয়েক বছর পূর্বে কাব্য সাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য বই —বোদলেয়ারের 'ফ্লার দ্য মাল' ও হুইটম্যানের 'লীভ্‌স্ অব গ্র্যাস'—বেরিয়েছে; বাস্তববাদী উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ (তখন পর্যন্ত) 'মাদাম বোভারি'ও বেরিয়েছে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের যে বছর জন্ম সে বছর তুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স', ডিকেন্সের 'গ্রেট এক্সপেক্টেশানস্', জর্জ এলিয়টের 'সাইলাস মার্নার', রীডের 'দি ক্লয়স্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নীচে রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের উল্লেখযোগ্য লেখক এবং তাঁদের গ্রন্থের নাম দেওয়া হল। এই তালিকা থেকে দেখা যাবে 'বলাকা' যে বছর প্রকাশিত হল সে বছর য়ুরোপ-আমেরিকায় কি কি উল্লেখযোগ্য বই বেরিয়েছে এবং সে-সব বই কারা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বা তাঁর বিশেষ কোন বইয়ের সঙ্গে অন্য কোনো লেখকের রচনার তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা যে পথে অগ্রসর হয়েছে তার পাশে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ধারাটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে শুধু। কোনো দেশের মানচিত্র পৃথকভাবে দেখা যেতে পারে, আবার পৃথিবীর মানচিত্রে আন্তর্জাতিক পরিবেশেও দেখা যেতে পারে। সাহিত্যের বৃহত্তর মানচিত্রের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-রচনাকে দেখবার প্রাথমিক প্রয়াস করা হয়েছে এই তালিকায়। এই তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন লেখকদের নামও পাওয়া যাবে।

১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হয়। ঐ বছর থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা বইয়ের তালিকা; তার পরে পাওয়া যাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঐ বছরে প্রকাশিত কয়েকটি বই এবং গ্রন্থকারদের বিবরণ। পুস্তক নির্বাচনে লেখকের শ্রেষ্ঠ বই সকল ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব হয়নি। হয়ত রবীন্দ্রনাথের কোনো বই এক বছর বের হয়নি; সে বছর অন্য লেখকের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বের হলেও তালিকায় সেটি উল্লেখ করবার সুযোগ নেই। আবার হয়ত কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা ১৮৭৮-এর পূর্বে অথবা ১৯৪১-এর পরে বেরিয়েছে; অথচ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর রচনার মূল্য আছে। এই জন্য

নির্দিষ্ট কাল-খণ্ডের মধ্যে যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে তারা এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। কালানুসারী তালিকার সঙ্গে লেখকের নামটি যুক্ত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালের পরে রবীন্দ্রনাথের যে-সব বই বেরিয়েছে তাদের এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিকের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী'র উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত তালিকায় রবীন্দ্র-রচনার কালানুক্রমিক বিন্যাস করা হয়েছে।

সংকেত: B—জীবনী; D—নাটক; E—প্রবন্ধ; N—উপন্যাস; P—কবিতা; Ph—দর্শন ও তত্ত্বমূলক; S—ছোটগল্প।

১৮৭৮

কবি-কাহিনী। কাব্য।

Thomas Hardy (1840-1928) : The Return of the Native (N)

Henry James (1843-1916) : Daisy Miller (N)

১৮৮০

বনফুল। কাব্য-কাহিনী।

George Meredith (1828-1909) : The Tragic Comedians (N)

Lew Wallace (1827-1905) : Ben Hur (N)

H. W, Longfellow (1807-1882) : Ultima Thule (P)

Fyodor M. Dostoyevsky (1821-1881) : Brothers Karamazov, 1879-'80. (N)

Guy de Maupassant (1850-1893) : The Ball of Fat (S)

Emile Zola (1840-1902) : Nana (N)

১৮৮১

বাল্মীকি প্রতিভা। গীতিনাট্য।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য।

রুদ্রচণ্ড। নাটক।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ভ্রমণ-চিত্র।

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) : Ballads and Sonnets (P)

A. C. Swinburne (1837-1909) : Mary Stuart (D)

Henry James (1843-1916) : The Portrait of a Lady (N)

Anatole France (1844-1924) : The Crime of Sylvestre Bonnard (N)

Henrik Ibsen (1828-1906) : Ghosts (D)

José Echegaray (1833-1916) : The Great Galeoto (D)

Paul Verlaine (1844-1896) : Segesse (P)

১৮৮২

সন্ধ্যাসঙ্গীত। কাব্য।

কালমৃগয়া। গীতিনাট্য।

Mark Twain (1835-1910) : The Prince and the Pauper (N)

Walt Whitman (1819-1892) : Specimen Days and Collect (B)

Henrik Ibsen (1828-1906) : An Enemy of the People (D)

H. F. Amiel (1821-1881) : Intimate Journal, 1882-'84. (B)

Richard Wagner (1813-1883) : Parsifal (D)

১৮৮৩

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। উপন্যাস।

প্রভাত-সঙ্গীত। কাব্য।

বিবিধ-প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ।

R. L. Stevenson (1850-1894) : Treasure Island (N)

Olive Schreiner (1855-1920) : The Story of an African Farm (N)

Mark Twain (1835-1910) : Life on the Mississippi (Adventure)

Victor Marie Hugo (1802-1885) : La Legende des Siecles, 1859-'83. (History & legend)

Guy de Maupassant (1850-1893) : A Life (N)

Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) : Thus Spake Zarathustra, 1883-'91. (Ph)

B. Bjornson (1832-1910) : Beyond Human Might (D)

১৮৮৪

ছবি ও গান। কবিতা।

প্রকৃতির প্রতিশোধ। নাট্যকাব্য।

নলিনী। নাটিকা।

শৈশব সঙ্গীত। কবিতা।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কবিতা।

Mark Twain (1835-1910) : Huckleberry Finn (N).

Alphonse Daudet (1840-1897) : Sapho (N)

J. K. Huysmans (1848-1907) : Against Nature (N)

Leconte de Lisle (1818-1894) : Tragic Poems (P)

Paul Verlaine (1844-1896) : Jadis et Naguere (P)

১৮৮৫

রামমোহন রায়। প্রবন্ধ।

আলোচনা। প্রবন্ধ।

রবিচ্ছায়া। গান।

George Meredith (1828-1909) : Diana of the Crossways (N)

John Ruskin (1819-1900) : Praeterita (B)

Emile Zola (1840-1902) : Germinal (N)

১৮৮৬

কড়ি ও কোমল। কবিতা।

R. L. Stevenson (1850-1894) : Dr. Jekyll and Mr. Hyde (N)

Alfred Tennyson (1809-1892) : Locksley Hall Sixty Years After (P)

Arthur Rimbaud (1854-1891) : Les Illuminations (P)

Pierre Loti (1850-1923) : An Iceland Fisherman (N)

১৮৮৭

রাজর্ষি। উপন্যাস।

চিঠিপত্র। পত্রসাহিত্য।

August Strindberg (1849-1912) : The Father (D)

Stéphane Mallarmé (1842-1898) : Poesies (P)

১৮৮৮

সমালোচনা। প্রবন্ধ।

মায়ার খেলা। গীতিনাট্য।

Mathew Arnold (1822-1888): Essays in Criticism 2nd series (E)

Guy de Maupassant (1850-1893) : Pierre et Jean (N)

Paul Verlaine (1844-1896) : Amour (P)

Emile Zola (1840-1902) : La Terre (N)

১৮৮৯

রাজা ও রাণী। নাটক।

Robert Browning (1812-1889) : Asolando (P)

Walter Pater (1839-1894) : Appreciations (E)

Leo Tolstoi (1828-1910) : Kreutzer Sonata (N)

১৮৯০

বিসর্জন। নাটক।

মানসী। কবিতা।

Emily Dickinson (1830-1886) : Poems (P)

Knut Hamsun (1859-1952) : Hunger (N)

১৮৯১

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি। ১ম খণ্ড। ভ্রমণ-সাহিত্য।

Thomas Hardy (1840-1928) : Tess of the D'Urbervilles (N)

Arthur Conan Doyle (1859-1930) : Adventures of Sherlock Holmes (S)

Oscar Wilde (1856-1900) : The Picture of Dorian Gray (N)

Selma Lagerlof (1858-1940) : Gosta Berling's Saga (N)

Richard Dehmel (1863-1920) ; Redemptions (P)

Frank Wedekind (1864-1918) : The Awakening of Spring (D)

Maurice Maeterlinck (1862-1949) : The Blind (D)

১৮৯২

চিত্রাঙ্গদা। নাট্যকাব্য।

গোড়ায় গলদ। প্রহসন।

Rudyard Kipling (1865-1936) : Barrack Room Ballads (P)

W. B. Yeats (1865-1939) : The Countess Cathleen (D)

Oscar Wilde (1856-1900) : Lady Windermere's Fan (D)

Giovanni Verga (1840-1922) : Mastro Don Gesualdo (N)

১৮৯৩

গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা। গান ও গীতিনাট্য।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি। দ্বিতীয় খণ্ড। ভ্রমণ-সাহিত্য।

Christina Rossetti (1830-1894) : Verses (P)

G. B. Shaw (1856-1950) : Mrs. Warren's Profession (D)

Arthur Schnitzler (1862-1931) : Anatol (P)

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) : Death and the Fool (D)

Emile Zola (1840-1902) : Rougon-Macquart Series (N) completed (began in 1871)

১৮৯৪

সোনার তরী। কবিতা।

ছোটগল্প।

বিচিত্র গল্প।

George Moore (1852-1933) : Esther Waters (N)

Karl Marx (1818-1883) : Capital 3 vols. 1869-'94 (E)

Oscar Wilde (1856-1900) : Salome (D)

১৮৯৫

গল্পদশক।

H. G. Wells (1866-1946) : The Time Machine (N)

Joseph Conrad (1857-1924) : Almayer's Folly (N)

Stephen Crane (1871-1900) : The Red Badge of Courage (N)

Theodor Fontane (1819-1898) : Effie Briest (N)

১৮৯৬

নদী। কবিতা।

চিত্রা। কবিতা।

Thomas Hardy (1840-1928) : Jude the Obscure (N)

A. E. Housman (1859-1936) : A Shropshire Lad (P)

Gerhart Hauptmann (1862-1946) : The Sunken Bell (D)

Pierre Louys (1870-1925) : Aphrodite (N)

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) : Quo Vadis (N)

১৮৯৭

বৈকুণ্ঠের খাতা। প্রহসন।

পঞ্চভূত। প্রবন্ধ।

H. G. Wells (1866-1946) : The Invisible Man (N)

Edmond Rostand (1868-1918) : Cyrano de Bergerac (D)

Verner von Heidenstam (1859-1940) : The Charles Men (N)

১৮৯৯

কণিকা। কবিতা।

Emile Verhaeren (1855-1916) : Poems

G. Carducci (1835-1907) : Rime e Ritmi (P)

Leo Tolstoi (1828-1910) : Resurrection (N)

১৯০০

কথা। কবিতা।

কাহিনী। কবিতা।

কল্পনা। কবিতা।

ক্ষণিকা। কবিতা।

Laurence Binyon (1860-1943) : Odes (P)

Joseph Conrad (1857-1924) : Lord Jim (N)

Carl Spitteler (1845-1924) : Olympian Spring, 1900-'05 (P)

Gabriele D'Annunzio (1863-1938) : The Flame of Life (N)

১৯০১

নৈবেদ্য। কবিতা।

Rudyard Kipling (1865-1936) : Kim (N)

James Barrie (1860-1937) : Quality Street (D)

Frank Norris (1870-1902) : The Octopus (N)

Anton Chekhov (1860-1904) : The Three Sisters (D)

Thomas Mann (1875-1955) : Buddenbrooks (N)

১৯০৩

চোখের বালি। উপন্যাস।

Thomas Hardy (1840-1928) : The Dynasts, 1903-'08 (P)

Samuel Butler (1835-1902) : The Way of All Flesh (N)

G. B. Shaw (1856-1950) : Man and Superman (D)

Thomas Mann (1875-1955) : Tonio Kroger (S)

১৯০৫

আত্মশক্তি। প্রবন্ধ।

বাউল। গান।

Oscar Wilde (1856-1900) : De Profundis (B)

H. G. Wells (1866-1946) : Kipps (N)

১৯০৬

ভারতবর্ষ। প্রবন্ধ।

খেয়া। কবিতা।

নৌকাডুবি। উপন্যাস।

O. Henry (1862-1910) : The Four Million (S)

Upton Sinclair (1878- ) : The Jungle (N)

Erik A. Karlfeldt (1864-1931) : Flora and Pomona (P)

M. A. Nexo (1869-1954) : Pelle the Conqueror, 1906-'10 (N)

১৯০৭

বিচিত্র প্রবন্ধ।

চারিত্রপূজা। প্রবন্ধ।

প্রাচীন সাহিত্য। প্রবন্ধ।
লোকসাহিত্য। প্রবন্ধ।
সাহিত্য। প্রবন্ধ।
আধুনিক সাহিত্য। প্রবন্ধ।
হাস্যকৌতুক।
ব্যঙ্গকৌতুক।
J. M. Synge (1871-1909) : The Playboy of the Western World (D)
W. B. Yeats (1865-1939) : Deirdre (D)
Stefan George (1868-1933) : The Seventh Ring (P)
Henri Bergson (1859-1941) : Creative Evolution (Ph)
Jacinto Benavente (1866-1954) : The Bonds of Interest (D)
Maxim Gorki (1868-1936) : Mother (N)

১৯০৮

প্রজাপতির নির্বন্ধ। উপন্যাস।
রাজা প্রজা। প্রবন্ধ।
সমূহ। প্রবন্ধ।
স্বদেশ। প্রবন্ধ।
সমাজ। প্রবন্ধ।
শারদোৎসব। নাটক।
শিক্ষা। প্রবন্ধ।
মুকুট। নাটক।
Arnold Bennett (1867-1931) : The Old Wives' Tale (N)
Leonid Andreiev (1871-1919) : The Seven That Were Hanged (N)
Alexander Kuprin (1870-1938) : Yama, the Pit (N)
Hermann Sudermann (1857-1928) : The Song of Songs (N)
R. F. A. Sully Prudhomme (1839-1907) : Les Epaves (P)
Anatole France (1844-1924) : Penguin Island (Satire)

১৯০৯

শব্দতত্ত্ব। প্রবন্ধ।
ধর্ম। প্রবন্ধ।
শান্তিনিকেতন। প্রবন্ধ।
প্রায়শ্চিত্ত। নাটক।
বিদ্যাসাগর চরিত। প্রবন্ধ।
শিশু। কবিতা।
H. G. Wells (1866-1946) : Ann Veronica (N)
Andre Gide (1869-1951) : Strait is the Gate (N)
Maurice Maeterlink (1862-1949) : The Blue Bird (D)
J. V. Jensen (1873-1950) : The Long Journey (N)
Sigmund Freud (1856-1939) : The Interpretation of Dreams (E)

১৯১০

গোরা। উপন্যাস।
গীতাঞ্জলি। কবিতা।
রাজা। নাটক।
E. M. Forster (1879- ) : Howard's End (N)
John Galsworthy (1867-1933) : Justice (D)
Paul Claudel (1868-1955) : The Tidings Brought to Mary (D)
Ivan Bunin (1870-1953) : The Village (N)
Sigmund Freud (1856-1939) : Three Contributions to the Theory of Sex (Ph)

১৯১১

শান্তিনিকেতন, দ্বাদশ খণ্ড। প্রবন্ধ।
Max Beerbohm (1872-1956) : Zuleika Dobson (N)
Rudolf Eucken (1846-1926) : The Truth of Religion (Ph)

১৯১২

ডাকঘর। নাটক।

গল্প চারিটি।

মালিনী। নাটক।

চৈতালি। কবিতা।

বিদায়-অভিশাপ। নাটিকা।

জীবন-স্মৃতি। আত্মচরিত।

ছিন্নপত্র। পত্র-সাহিত্য।

অচলায়তন। নাটক।

Robert Bridges (1844-1930) : Poetical Works

Maxim Gorki (1868-1936) : The Lower Depths (D)

Romain Rolland (1866-1944) : Jean Christophe, 1904-'12 (N)

Miguel de Unamuno ( 1864-1936) : The Tragic Sense of Life (P)

১৯১৪

স্মরণ। কবিতা।

উৎসর্গ। কবিতা।

গীতিমাল্য। কবিতা।

গীতালি। কবিতা।

G. K. Chesterton (1874-1936) : The Wisdom of Father Brown (N)

Ivan Bunin (1870-1953) : The Cup of Life (S)

James Joyce (1882-1941) : Dubliners (S)

১৯১৫

শান্তিনিকেতন, চতুর্দশ খণ্ড। প্রবন্ধ।

Somerset Maugham (1874- ) : Of Human Bondage (N)

Verner von Heidenstam (1859-1940) : New Poems

১৯১৬

ফাল্গুনী। নাটক।

ঘরে বাইরে। উপন্যাস।

সঞ্চয়। প্রবন্ধ।

বলাকা। কবিতা।

চতুরঙ্গ। উপন্যাস।

গল্প-সপ্তক।

Carl Sandburg ( 1878- ) : Chicago Poems

John Masefield (1878- ) : Sonnets and Poems

Henri Barbusse (1874-1935) : Under Fire (N)

Emile Verhaeren (1855-1916) : Plays

Vincente Blasco Ibanez (1867-1928) : The Four Horsemen of the Apocalypse (N)

Leonid Andreiev (1871-1919) : He Who Gets Slapped (D)

Vladimir Mayakovsky (1894-1930) : A Cloud in Pants (P)

১৯১৭

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। প্রবন্ধ।

Boris Pasternak (1890-1960) : Life My Sister (P)

Paul Valery (1871-1945) : The Young Fate (P)

Knut Hamsun (1859-1952) : Growth of the Soil (N)

Georg Kaiser (1878-1945) : Gas Trilogy, 1917-'20 (D)

Juan Ramon Jimenez (1881-1958) : Platero and I (Prose Poem)

১৯১৮

পলাতকা। কবিতা।

D. H. Lawrence (1885-1930) : New Poems

Rupert Brooke (1887-1915) : Collected Poems

Lytton Strachey (1880-1932) : Eminent Victorians (B)

Gerard Manley Hopkins (1844-1889) : Poems

Alexander Blok (1880-1921) : The Twelve (P)

Johan Bojer (1872- ) : The Great Hunger (N)

১৯১৯

জাপান-যাত্রী। ভ্রমণ কাহিনী।

Somerset Maugham (1874- ) : The Moon and Sixpence (N)

F. E. Sillanpaa (1888- ) : Meek Heritage (N)

১৯২০

অরূপ রতন। নাটক।

পয়লা নম্বর। গল্প।

Walter De la Mare (1873-1956) : Collected Poems

. G. Wells (1866-1946) : The Outline of History

Paul Valery (1871-1945) : Graveyard by the Sea (P)

Grazia Deledda (1872-1936) : The Mother (N)

Vladimir Mayakovsky (1894-1930) : 150 Million (P)

Emil Ludwig (1881-1948) : Goethe (B)

Ernst Toller (1893-1939) : Man and the Masses (D)

১৯২১

ঋণশোধ। নাটিকা।

D. H. Lawrence (1885-1930) : Women in Love (N)

G. B. Shaw (1856-1950) : Back to Methuselah (D)

Karel Capek (1890-1938) : R. U. R. (D)

Walter De la Mare (1873-1956) : Memoirs of a Midget (N)

John Dos Passos (1896- ) : Three Soldiers (N)

Eugene O'Neill (1888-1953) : The Emperor Jones (D)

Luigi Pirandello (1867-1936) : Six Characters in Search of an Author (D)

১৯২২

মুক্তধারা। নাটক।

লিপিকা। কথিকা।

শিশু ভোলানাথ। কবিতা।

James Joyce (1882-1941) : Ulysses (N)
T. S. Eliot (1888- ) : The Waste Land (P)
John Galsworthy (1867-1933) : Forsyte Saga (N)
Sinclair Lewis (1885-1951) : Babbitt (N)
Romain Rolland (1856-1944) : The Enchanted Soul, 1922-'36 (N)
Roger Martin du Gard (1881-1958) : The World of the Thibaults (N)
Francois Mauriac ( 1885- ) : The Kiss to the Leper (N)
Ernst Toller (1893-1939) : The Machine Wreckers (D)

১৯২৩

বসন্ত। গীতিনাট্য।
G. B. Shaw (1856-1950) : Saint Joan (D)
R. M. Rilke (1875-1926) : Sonnets to Orpheus ; & Duino Elegies (P)
Hermann Hesse (1877-1962) : Siddhartha (N)
Andre Maurois (1885- ) : Ariel : the Life of Shelley (B)
L. S. Reymont (1868-1925) : The Peasants, 1924-'25 (N)
Alexey Tolstoy (1882-1945) : The Road to Cavalry (N)

১৯২৫

পূরবী। কবিতা।
গৃহপ্রবেশ। নাটক।
প্রবাহিনী। গান।
E. E. Cummings (1894-1962) : XLI Poems
Ezra Pound (1885- ) : Cantos I-XV (P)
Franz Kafka (1883-1924) : The Trial (N)
Francois Mauriac (1885- ) : The Desert of Love (N)

১৯২৬

চিরকুমার সভা। নাটক।
শোধবোধ। নাটক।

নটীর পূজা। নাটক।

রক্তকরবী। নাটক।

Eugene O'Neill ( 1888-1953) : The Great God Brown (D)

Sean O'Casey (1884- ) : The Plough and the Stars (D)

George Russell (A. E. 1867-1935) : Collected Poems

I. A. Richards ( 1893- ) : The Principles of Literary Criticism (E)

Andre Gide (1869-1951) : The Counterfeiters (N)

১৯২৭

লেখন। কবিতা।

ঋতুরঙ্গ। গীতিনাট্য।

Virginia Woolf (1882-1941) : To the Lighthouse (N)

Hermann Hesse (1877-1962) : Wolf of the Steppes (N)

Thomas Mann (1875-1955) : Magic Mountain (N)

১৯২৮

শেষরক্ষা। প্রহসন।

Eugene O'Neill (1888-1953) : Strange Interlude (D)

W. B. Yeats (1865-1939) : The Tower (P)

Aldous Huxley (1894- ) : Point Counter Point (N)

Marcel Proust ( 1871-1922) : Remembrance of Things Past, 1913-'28 (N)

Federigo Garcia Lorca (1899-1936) : Romancero Gitano (P)

১৯২৯

যাত্রী। ভ্রমণ-সাহিত্য।

যোগাযোগ। উপন্যাস।

শেষের কবিতা। উপন্যাস।

তপতী। নাটক।

মহুয়া। কবিতা।

Robert Bridges (1844-1930) : The Testament of Beauty (P)

William Faulkner (1897-1962) : The Sound and the Fury (N)

Ernest Hemingway (1898-1961) : Farewell to Arms (N)
E. M. Remarque (1897- ) : All Quiet on the Western Front (N)

১৯৩০

ভানুসিংহের পত্রাবলী।
Edith Sitwell (1887- ) : Collected Poems
Robert Frost (1875-1963) : Collected Poems
Paul Eluard (1895-1952) : The Immaculate Conception (P)
St. John Perse (1887- ) : Anabase, tr. in 1930
Jean Giono (1895- ) : Harvest (N)

১৯৩১

রাশিয়ার চিঠি। প্রবন্ধ।
বন-বাণী। কবিতা।
শাপমোচন। কথিকা ও গান।
Lawrence Binyon (1860-1943) : Collected Poems
Pearl Buck (1892- ) : The Good Earth (N)
Wm. Faulkner (1897-1962) : Sanctuary (N)
Louis Aragon (1897- ) : Red Front (P)
H. K. Laxness (1902— ) : Salka Volka (N)

১৯৩২

পরিশেষ। কবিতা।
কালের যাত্রা। নাটিকা।
পুনশ্চ। কবিতা।
T. S. Eliot ( 1888- ) : Selected Essays
Jules Romains (1885- ) : Men of Good Will (N)
Alberto Moravia (1907- ) : The Indifferent Ones (N)

১৯৩৩

দুই বোন। উপন্যাস।
মানুষের ধর্ম। প্রবন্ধ।
বিচিত্রিতা। কবিতা।

চণ্ডালিকা। নাটিকা।
তাসের দেশ। নাটিকা।
বাঁশরী। নাটিকা।
ভারতপথিক রামমোহন রায়। প্রবন্ধ।
শিক্ষার বিকীরণ। প্রবন্ধ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। প্রবন্ধ।
Stephen Spender (1909- ) : Poems
W. H. Auden (1907- ) : The Dance of Death (D)
F. Garcia Lorca (1899-1936) : Blood Wedding (D)
Georges Duhamel (1884- ) : Pasquier Chronicles (N)
Andre Malraux (1901- ) : Man's Fate (N)

১৯৩৪

মালঞ্চ। উপন্যাস।
চার অধ্যায়। উপন্যাস।
Robert Graves (1895- ) : I, Claudius (N)
Evelyn Waugh (1903- ) : A Handful of Dust (N)
W. B. Yeats (1865-1939) : Collected Poems
Stefan Zweig (1881-1942) : Kaleidoscope (S)
Jean Cocteau (1891- ) : The Infernal Machine (D)
M. Sholokhov (1905- ) : And Quiet Flows the Don (N)

১৯৩৫

শেষ সপ্তক। কবিতা।
বীথিকা। কবিতা।
T. S. Eliot (1888- ) : Murder in the Cathedral (D)
Cecil Day-Lewis (1904- ) : A Time to Dance (P)

১৯৩৬

পত্রপুট। কবিতা।
ছন্দ। প্রবন্ধ।
জাপানে-পারস্যে। ভ্রমণ-সাহিত্য।
শ্যামলী। কবিতা।

সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ।

W. H. Auden (1907- ) : The Ascent of F. 6. (D. with Isherwood)

William Faulkner (1897-1962) : Absalom, Absalom (N)

Ignazio Silone (1900- ) : Bread and Wine (N)

F. Garcia Lorca (1899-1936) : The House of Bernarda Alba (D)

Thomas Mann (1875-1955) : Joseph in Egypt (N)

১৯৩৭

খাপছাড়া। ছড়া।

কালান্তর। প্রবন্ধ।

সে। গল্প।

ছড়ার ছবি। কবিতা।

বিশ্ব-পরিচয়। প্রবন্ধ।

Aldous Huxley (1894- ) : Ends and Means (E)

John Steinbeck (1902- ) : Of Mice and Men (N)

Virginia Woolf (1882-1941) : The Years (N)

Andre Malraux (1801- ) : Man's Hope (N)

E. M. Remarque (1897- ) : Three Comrades (N)

১৯৩৮

প্রান্তিক। কবিতা।

পথে ও পথের প্রান্তে। পত্র-সাহিত্য।

সেঁজুতি। কবিতা।

বাংলা ভাষা পরিচয়। প্রবন্ধ।

G. B. Shaw (1856-1950) : Geneva (D)

Somerset Maugham (1874- ) : The Summing Up (B)

Ezra Pound (1885- ) : Culture (E)

Robert Graves (1895- ) : Collected Poems

Jean-Paul Sartre (1905- ) : Nausea (N)

Paul Eluard (1895-1952) : Natural Course (P)

Bertold Brecht (1898-1956 ) : Senora Carrar's Rifles (D)
Luigi Pirandello (1867-1936) : A Character in Distress (N)

১৯৩৯

প্রহাসিনী। কবিতা।
আকাশ-প্রদীপ। কবিতা।
শ্যামা। নৃত্যনাট্য।
পথের সঞ্চয়। পত্র-সাহিত্য।
Stephen Spender (1909- ) : The Still Centre (P)
A. E. Housman (1859-1936) : Collected Poems
Robert Frost (1875-1963) : Collected Poems
Dylan Thomas (1914-1953) : The Map of Love (P)
John Steinbeck (1902- ) : The Grapes of Wrath (N)
Jean-Paul Sartre (1905- ) : The Wall (S)
Albert Camus (1913-1960) : Wedding Feasts (S)
Romain Rolland (1866-1944) : Robespierre (D)

১৯৪০

নবজাতক। কবিতা।
সানাই। কবিতা।
ছেলেবেলা। জীবনী।
তিনসঙ্গী। গল্প।
রোগশয্যায়। কবিতা।
Edith Sitwell (1887- ) : Poems New and Old
Ernest Hemingway (1898-1961) : For Whom the Bell Tolls (N)
Sean O'Casey (1884- ) : The Star Turns Red (D)
Thomas Mann (1875-1955) : The Transposed Heads (N)
Knut Hamsum (1859-1952) : Look Back on Happiness (N)
Georg Kaiser (1878-1944) : A Villa in Sicily (N)

১৯৪১

আরোগ্য। কবিতা

জন্মদিনে। কবিতা।

গল্পসল্প। গল্প ও কবিতা।

সভ্যতার সংকট। প্রবন্ধ।

ছড়া। কবিতা।

শেষ লেখা। কবিতা।

T. S. Eliot (1888- ) : Points of View (E)

Upton Sinclair (1878- ) : Between Two Worlds (N)

Virginia Woolf (1882-1941) : Between the Acts (N)

M. Sholokhov (1905- ) : The Don Flows Home to the Sea (N)

Louis Aragon (1897- ) : The Century Was Young (N)

# পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একশত বই

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে একশত বই নির্বাচন করা দুঃসাহস ছাড়া আর কী! গুটেনবার্গের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্যের এতগুলি সমৃদ্ধ সাহিত্যে কয়েক কোটি বই রচিত হয়েছে। এ সব পুস্তকের আঙ্গিক, বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কত পার্থক্য! প্রত্যেক সাহিত্যেই এমন কয়েক শত বই রয়েছে যাদের প্রতিটিরই পৃথক মূল্য আছে। সুতরাং শুধু দু-একটি বই নির্বাচন করে অবশিষ্টদের উপেক্ষা করলে কিছু পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতার যে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তথাপি প্রয়োজনের দিক থেকে লক্ষ্য রেখে কখনও কখনও এমন নির্বাচন করতে হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের গভীর প্রভাব পড়েছে। দেশের সাহিত্যের সম্যক্ উপলব্ধির জন্যও পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী পাঠক পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে যাতে মোটামুটি পরিচয় লাভ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই তালিকা সঙ্কলন করা হল। কর্মব্যস্ত পাঠকের পক্ষে একশ বইয়ের নামই যথেষ্ট। যাঁর সময় ও আগ্রহ আছে তিনি সহজেই নিজের জন্য একটি পরিপূরক তালিকা সঙ্কলন করে নিতে পারবেন।

তালিকায় উল্লিখিত বইগুলি স্বক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ পুস্তক এমন দাবি করা চলে না। বরং প্রত্যেকটির পরিবর্তে নতুন বইয়ের নাম সুপারিশ করা যেতে পারে। দুটি কথা মনে রেখে তালিকার বইগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় পাঠকের রুচি; দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতিধারা পুস্তকে কী পরিমাণ প্রতিফলিত হয়েছে।

এই তালিকা সঙ্কলনের পূর্বে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের রচিত তালিকা বিচার করে দেখা হয়েছে। তথাপি সঙ্কলকের ব্যক্তিগত রুচি স্বভাবতঃই নির্বাচনে যে প্রাধান্য লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট, ওথেলো না কিং লীয়র তালিকায় স্থান পাবে? নিজের রুচির উপর নির্ভর না করলে এসব প্রশ্নের সমাধান করা যায় না। দস্তয়েভস্কির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোন্‌টি সে সম্বন্ধে সাহিত্যরসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। Crime and Punishment, Brothers Karamazov এবং Idiot—এই তিনটিকেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা

প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রেও সঙ্কলকের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাড়া পথ নেই।

সমারসেট মম নিম্নলিখিত দশটি বইকে পাশ্চাত্ত্যসাহিত্যের মহৎ উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন: War and Peace; Old Goriot; Tom Jones; Pride and Prejudice; The Red and the Black; Wuthering Heights; Madame Bovary; David Copperfield; The Brothers Karamazov ও Moby Dick. মমের সুপারিশ আমরা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারিনি।

উপরে আমরা ব্যক্তিগত রুচির কথা বললেও বহুলপ্রচলিত ধারণাকে তালিকা সঙ্কলনে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত রুচি কখনও কখনও চিরাচরিত ধারণা অগ্রাহ্য করে চলে। টমাস মানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি যদি অকস্মাৎ ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে কোন্ কোন্ বই নতুন করে সংগ্রহ করবার কথা প্রথম মনে হবে? মান ঊনত্রিশটি বইয়ের নাম দিয়েছিলেন—তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বইগুলির নাম। এই তালিকা থেকে দেখা যাবে ফ্লোবেয়ারের Madame Bovary অপেক্ষা তাঁর ভাল লাগত Sentimental Education; গ্যেটের Faust-এর নাম তিনি করেননি, করেছেন Wilhelm Meister's Apprenticeship-এর নাম। এই জাতীয় একান্ত ব্যক্তিগত ভাল লাগাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের অনেক পাঠকেরই পরিচয় আছে। কিন্তু বর্তমানকালের সাহিত্য যে ধারার পরিণতি তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পূর্ববর্তী সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি পড়া প্রয়োজন। আমাদের তালিকার সবগুলি বই—বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দী ও তার আগে রচিত বই—আধুনিক পাঠকের নিকট সুখপাঠ্য হবে না। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং কোনও কোনও বইয়ের বৃহৎ আকার অনায়াস-পাঠের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ পাঠক এই অন্তরায় অতিক্রম করে কি ভাবে মূল্যবান গ্রন্থের রসাস্বাদন করতে হয় তার কৌশল জানেন।

তালিকার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বই Everyman's, Library, Modern Library, Nelson Classics, World Classics প্রভৃতি সিরিজে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া Penguin, Pelican, Pocket Books, Mentor Books, Signet Books প্রভৃতি সস্তা পেপার ব্যাক সংস্করণেও অনেক বই পাওয়া যায়।

১। Aeschylus 525-456 B. C. : Agamemnon.

গ্রাক নাটকের প্রবর্তক ঈস্কাইলাসের ট্রিলজির প্রথম নাটক। পরবর্তী নাটক দুটির নাম *Choephori* ও *Eumenides*. আগামেমনন দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্য নিজের মেয়ে ইফিজেনিয়াকে বলি দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ক্লাইটিমনেস্ট্রা মেয়ের শোক ভুলতে পারেনি। দীর্ঘকাল পরে ট্রয় যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর উপপতির সহায়তায় ক্লাইটিমনেস্ট্রা স্বামীকে হত্যা করে সন্তান হারাবার প্রতিশোধ গ্রহণ করল। এই শক্তিশালী নাটকে ক্লাইটিমনেস্ট্রা একটি আশ্চর্য চরিত্র। ক্লাইটিমনেস্ট্রা লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র মনে করিয়ে দেয়।

২। Andersen, Hans Christian 1805-'75 : Fairy Tales.

ড্যানিস লেখক অ্যাণ্ডারসেন বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁর রূপকথাগুলির জন্য। কল্পনার ঐশ্বর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং লেখকের গভীর হৃদয়ানুভূতি গল্পগুলিকে সকল দেশের পাঠকের নিকট প্রিয় করেছে। কিশোরদের জন্য রচিত হলেও প্রাপ্তবয়স্করাও অ্যাণ্ডারসেনের রচনা থেকে প্রচুর আনন্দ লাভ করে থাকে।

৩। Aristophanes 450-380 (?) B. C. : The Frogs.

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক গ্রাক নাট্যকার। সমসাময়িক সমাজের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন কোনও কোনও নাটকে। 'দি ফ্রগ্‌স্' বিদ্রূপাত্মক কমেডি। দেবতা ডায়োনিসাস পাতালে এসেছেন একজন নাট্যকারকে এথেন্স নিয়ে যাবার জন্য। কাকে নেবেন? ঈস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের মধ্যে কার দাবি অগ্রগণ্য? শেষ পর্যন্ত ঈস্কাইলাসকেই নির্বাচন করলেন ডায়োনিসাস। নির্বাচনের ব্যাপারে মতভেদকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন গ্রীসের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কলহকে বিদ্রূপ করেছেন।

৪। Aristotle 384-322 B. C. : Poetics.

গ্রীক দার্শনিক। কাব্য ও নাটকের মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমালোচনার ভিত্তি রচনা করেছে অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স্'।

৫। Austen, Jane 1775-1817 : Pride and Prejudice.

মধ্যবিত্ত বেনেট পরিবারের পাঁচ বোনের কাহিনী। নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ।

৬। Bacon, Francis 1561-1626 : The Advancement of Learning.

মধ্যযুগের সঙ্কীর্ণ বাঁধাপথের বিদ্যাচর্চা ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে জ্ঞানচর্চার আহ্বান। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবযুগের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

৭। Balzac, Honore de 1799-1850 : Old Goriot.

স্নেহান্ধ পিতার প্রতি সন্তানদের অকৃতজ্ঞতার হৃদয়বিদারক কাহিনী। শেক্সপীয়ারের কিং লীয়রের সহিত তুলনীয়। বস্তুতান্ত্রিক ফরাসী লেখক বালজাকের "দি হিউম্যান কমেডি" সিরিজের অন্তর্ভুক্ত একটি উপন্যাস।

৮। Baudelaire, Pierre Charles 1821-'67 : Flowers of Evil.

ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত (১৮৫৭) হবার পর অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিশেষ করে ফরাসী কাব্য এবং সাধারণ ভাবে য়ুরোপীয় কাব্য Flowers of Evil-এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

৯। The Bible. আনুমানিক রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৩০০।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে Authorized Version of the Bible ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণকে বলা হয় : "Noblest monument of English prose." পাশ্চাত্যের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় বাইবেলের প্রভাব অপরিসীম

১০। Boccaccio, Giovanni 1313-'75 : The Decameron.

ইতালিয়ান লেখকের ১০০টি ছোটগল্পের সংগ্রহ। আদিরসাত্মক প্রেমের কাহিনীর সংখ্যাই বেশী। নীতিমূলক গল্পও আছে। কলানৈপুণ্যের জন্য গল্পগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। চসার, শেক্সপীয়ার, ড্রাইডেন, মলিয়ের প্রভৃতি লেখক ডিকামেরন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আধুনিক ছোটগল্পের অগ্রদূত এ বই।

১১। Bojer, Johan 1872- : The Great Hunger.

নরওয়ের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের আদর্শবাদী উপন্যাস। অপরিসীম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে পীয়ার হোমের আত্মার মহৎ ক্ষুধা-নিবৃত্তির অভিযান-কাহিনী। একজন সমালোচক এ বই সম্বন্ধে বলেন : "Comes nearer the dignity and power of Greek drama in its perfection..."

১২। Boswell, James 1740-'95 : Life of Samuel Johnson.

ডঃ স্যামুয়েল জনসনের অসাধারণ জীবনী। মেকলে বলেন : "Boswell is the first of biographers. He has no second..."

১৩। Browning, Robert 1812-'89 : Poems.

বুদ্ধিদীপ্ত জীবনাসক্তির সুন্দর ও বিচিত্র প্রকাশ পাওয়া যায় ব্রাউনিংয়ের কাব্যে।

১৪। Cellini, Benvenuto 1500-'71 : Autobiography.

প্রতিভাবান ইতালিয়ান স্বর্ণকারের বিচিত্র আত্মজীবনী। রেনেসাঁস যুগের ইতালীর চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়। পোপ, রাজা, শিল্পী প্রভৃতির জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র এঁকেছেন লেখক।

১৫। Cervantes, Miguel de Saavedra 1547-1616 : Don Quixote.

শিভ্যালরি ও রোমান্সের নেশায় আচ্ছন্ন তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ। মেকলে বলেছেন, এই স্প্যানিশ উপন্যাসটি "the best novel in the world, beyond comparison."

১৬। Chaucer, Geoffrey 1343 (?)-1400 : The Canterbury Tales.

এই গল্পগুলির পাত্র-পাত্রী ইংলণ্ডের মধ্যযুগের জীবন্ত প্রতিনিধি। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চসার কাহিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৭। Chekhov, Anton 1860-1904 : Stories & Plays.

অসামান্য গল্পকার। তাঁর নৈপুণ্য একমাত্র মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনীয়। যদিও দুজনের গল্পের জাত আলাদা। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলেছেন শেখভ। দি ডার্লিং, দি ব্ল্যাক মঙ্ক, ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স, দি কিস্, ইন এক্সাইল প্রভৃতি গল্প এবং দি চেরি অর্চার্ড, দি সী গার্ল, থ্রি সিস্টার্স প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত।

১৮। Comte, Auguste 1798-1857 : Positive Philosophy.

পজিটিভিজমের প্রবর্তক। "The doctrine of this socio-ethical religion is epitomized in the principle *vivre pour autrui*, to live for others."

১৯। Dante, Alighieri 1265-1328 : Divine Comedy.

মধ্যযুগের য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। ইতালিয়ান ভাষায় তিন খণ্ডে (Inferno, Purgatory, Paradise) রচিত এপিক কাব্য। মানবাত্মার তীর্থযাত্রার কাহিনী। এই কাব্য হল "at once a vision of the other world,

an allegory of the Christian life, a spiritual autobiography, and a cyclopaedic embodiment of all the knowledge of the day."

২০। Darwin, Charles, 1809-'82 : On the Origin of Species by Means of Natural Selection.

জীবজগতে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা করে আমাদের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত করেছেন ডারুইন। ডারুইনের দু-একটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন প্রশ্ন উঠলেও এ বই চিরদিন স্বীকৃতি পাবে।

২১। Defoe, Daniel 1659-1731 : Robinson Crusoe.

সুপরিচিত মনোমুগ্ধকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। 'রবিনসন ক্রুসোর' প্রেরণায় এই জাতীয় অসংখ্য কাহিনী রচিত হয়েছে।

২২। Deledda, Grazia 1872-1936 : The Mother.

তরুণ পাদ্রি পাওলোর উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য মা ও এক সুন্দরী বিধবার দ্বন্দ্বের কাহিনী। মর্মস্পর্শী বিয়োগান্ত উপন্যাস।

২৩। Dickens, Charles 1812-'70 : David Copperfield.

আত্মজীবনীমূলক সুবৃহৎ উপন্যাস। 'What treasuries of gaiety, invention, life, are in that book !"—M. Arnold.

২৪। Dostoyevsky, Feodor 1821-'81 : Brothers Karamazov.

চার ভাইয়ের কাহিনী। প্রত্যেক ভাই এক-একটি রাশিয়ান টাইপ। মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস। অবৈধ প্রেম, পিতৃহত্যা প্রভৃতি ঘটনার নাটকীয়তা এবং ট্র্যাজেডি পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। হিউ ওয়ালপোল এবং আর্নল্ড বেনেটের মতে এ বই হল "the greatest novel the world has yet seen."

২৫। Dreiser, Theodore 1871-1945 : An American Tragedy.

এক তরুণীকে ভুলিয়ে তার উপর অত্যাচার করবার পর হত্যা করবার অভিযোগে ক্লাইড গ্রিফিথের প্রাণদণ্ড হল। একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ড্রেইজার এই কাহিনী লিখেছেন। এই উপন্যাস সম্বন্ধে স্পেক্টেটার বলেছেন, "the finest work of fiction yet produced in the United States." জন ম্যাসি বলেছেন, এটি হল, "the Mount Everest of American fiction...One of the high hills of all the fiction in the world."

২৬। Eliot, Thomas Stearns 1888— : Collected Poems.

আধুনিক কাব্যসাহিত্যে বিশেষ প্রভাবশালী কবি। তাঁর কবিতার "has a technical eloquence equalled by the fewest of his contemporaries. His accomplishment may be measured by the every violence of the reaction against him."

২৭। Ellis, Havelock 1859-1939 : Psychology of Sex.

মানুষের গভীরতম অনুভূতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ্যে আলোচনার পথ উন্মুক্ত করেছেন এলিস। প্রথমে এ বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। বর্তমানে এলিসের কোনও কোনও মত স্বীকৃতি না পেলেও সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে এ বইয়ের গভীর প্রভাব পড়েছে।

২৮। Euripides 480-406 (?) B.C. : Medea.

গোল্ডেন ফ্লীসের সন্ধানে এসে জ্যাসনের পরিচয় হল মিডিয়ায় সঙ্গে। মিডিয়ার গভীর প্রেম কি ভাবে প্রতিহিংসায় পরিণত হল ইউরিপিডিস তারই নাট্যরূপ দিয়েছেন। মিডিয়ার মধ্যে আমরা এক অসামান্য নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ পাই।

২৯। Flaubert, Gustave 1821-80 : Madame Bovary.

এম্মা বোভারির বিশ্বাস ছিল বিয়ে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি। গ্রাম্য ডাক্তার স্বামী সে আশা ব্যর্থ করল। নতুন নতুন প্রেমিক সংগ্রহ করে সেই স্বপ্ন সার্থক করবার চেষ্টা করতে লাগল এম্মা। তার ফল হল মারাত্মক। একটি নারীচরিত্রের ক্রমাবনতির করুণ ইতিহাস ফ্লোবেয়ার লিখেছেন দীর্ঘ আট বছরের সাধনায়। বিশ্বসাহিত্যের সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসগুলির একটি।

৩০। Frazer, Sir James George 1854-1941 : The Golden Bough.

বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিগোষ্ঠীর লোকগাথা, পুরাণ, প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম, ম্যাজিক, টোটেম, ট্যাবু প্রভৃতির সঙ্কলন। লেখকের সহানুভূতি ও রচনাশৈলীর গুণে বারো খণ্ডের এই বিরাট বই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। এক খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও পাওয়া যায়। সাধারণ পাঠকের নিকট এ বই প্রিয় ; বিশেষজ্ঞরাও এ বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। ফ্রয়েড তাঁর অনেক তত্ত্বের সমর্থন পেয়েছেন এ বই থেকে।

৩১। Freud, Sigmund 1856-1939 : Outline of Psychoanalysis.

অন্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন প্রকৃতির শক্তি ও যন্ত্র। ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন মন। এই আবিষ্কার আধুনিক সাহিত্যকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ফ্রয়েডের এই বইটিতে তাঁর আবিষ্কারের মূল কথা পাওয়া যাবে।

৩২। Galsworthy, John 1867-1933 : The Forsyte Saga.

ভিক্টোরিয়ান যুগ থেকে ১৯২০ সন পর্যন্ত একটি ইংরেজ পরিবারের ইতিহাস কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির উপর সম্পত্তির প্রভাব এবং সামাজিক রীতি ও নীতিবোধের ক্রমপরিবর্তন নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে।

৩৩। Goethe, Johann Wolfgang von 1749-1832 : Faust (1)

বিশ্বসাহিত্যের অমর কাব্য-নাটক। অতিমানবিক শক্তি ও জ্ঞান লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় শয়তানের নিকট দাসখত লিখে দেবার কাহিনী। আধুনিক মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার কাব্যরূপ।

৩৪। Gorki, Maxim 1868-1936 : The Lower Depths.

দেশে-বিদেশে অভিনীত গোর্কির বিখ্যাত নাটক। The Night's Lodging, At the Bottom প্রভৃতি নামেও অনুবাদ হয়েছে। "...it is one of the finest character studies in Russian literature."

৩৫। Hamsun, Knut 1859- 1952 : Growth of the Soil.

উপন্যাসের নায়ক আইজাক নিঃসঙ্গ আদিম মানবের প্রতিনিধি। কেমন করে সে একে একে বাড়ি, জমি, সম্পত্তি, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি পেয়ে সামাজিক হয়ে উঠল তারই এপিক। সামাজিক মানুষের ইতিহাসের উপন্যাসরূপ।

৩৬। Hardy, Thomas 1840-1928 : Tess of the D'Urbervilles.

এক প্রতারিত রমণীর মর্মস্পর্শী কাহিনী।

৩৭। Heine, Heinrich 1797-1856 : Poems.

এই ভারতপ্রেমিক কবি হলেন "among the most illustrious poets in the world's literature."

৩৮। Hemingway, Ernest 1898—1961 : The Old Man and the Sea.

এক বৃদ্ধ জেলের বঁড়শীবিদ্ধ মার্লিন মাছ ধরবার জন্য তিনদিনব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাস। কাহিনী আকারে ছোট, কিন্তু ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ।

৩৯। Hesse, Hermann 1877— : Steppenwolf.

শিল্পী হ্যারি হ্যালারের মনে রূপ ও অরূপ এবং দেহ ও আত্মাকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তারই শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ। গল্পরসের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে।

৪০। Homer c. 900-800 B. C. : Iliad & Odyssey.

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাচীনতম লিখিত দলিল। ইলিয়াড ও ওডিসি দুটি সহযোগা মহাকাব্য। ইলিয়াড গ্রীক বাহিনীর ট্রয় নগরী বিজয়ের কাহিনী। ট্রয় যুদ্ধ থেকে ওডিসিয়ুসের ইথাকায় প্রত্যাবর্তনের পথে বিচিত্র অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিবরণ আছে ওডিসি মহাকাব্যে। বিশ্বসাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত ছাড়া এ দুটি মহাকাব্যের তুলনা নেই।

৪১। Hugo, Victor 1802-'85 : Les Miserables.

জ্যাঁ ভালজিনের অবিস্মরণীয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন নিষ্ঠুর সমাজ কি ভাবে মানুষকে সৎপথে চলতে বাধা দেয়। ঊনবিংশ শতকের গোড়াকার ফরাসী সমাজের ছবি হলেও আজও তা সত্য মনে হয়। গভীর মানবতাবোধ এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। "All through the book Hugo is concerned with the goodness of the individual and the cruelty of organised society."

৪২। Ibsen, Henrik 1828-1906 : Ghosts.

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সামাজিক নাটক। পিতার কাছ থেকে যৌনব্যাধি জন্মসূত্রে পেয়ে কি করে মিসেস আলভিঙের একমাত্র পুত্র অসওয়াল্ডের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পুত্রকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য মা কেমন করে নিজের হাতে ছেলের মুখে বিষ তুলে দিলেন, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী।

৪৩। Jeans, Sir James 1877-1946 : The Universe Around Us.

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা সরল ভাষায় মনোজ্ঞ করে সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত।

৪৪। Jensen, Johannes V. 1873-1950 : The Long Journey.

দিনেমার লেখকের বিরাট পটভূমিকায় রচিত সুবৃহৎ উপন্যাস। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার পর্যন্ত টিউটনিক জাতির ইতিহাস এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই শ্রেণীর অদ্বিতীয় উপন্যাস। "It is a stupendous combination of Darwinian science, imagination, humour, history and beauty."

৪৫। Joyce, James 1882-1941 : Ulysses.

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কথাসাহিত্যে নতুন পথপ্রদর্শক। মাত্র ষোল ঘণ্টার কাহিনী নিয়ে হোমারের ওডিসির ছায়াবলম্বনে এই বৃহৎ উপন্যাস রচিত। Stream-of-consciousness রীতির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অশ্লীলতার অভিযোগে কিছুকাল নিষিদ্ধ ছিল।

৪৬। Keats, John 1795-1821 : Poems.

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পূজারী রোমান্টিক কবি কীটস্। "His poetry is marked by youthful exuberance, intense sensual appeal and pictorial quality, imagination, emotion, a sense of symbolism, and attraction to mediaeval and supernatural subjects."

৪৭। Lagerlof, Selma 1858-1940 : The Story of Gosta Berling.

নায়কের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে তরুণীরা মুগ্ধ হয়ে দুঃখ পায়; নায়কও বিপদে পড়ে। অনেক অ্যাড্ভেঞ্চারের পর এলিজাবেথকে বিয়ে করে গোস্তা সুখী হল; এলিজাবেথের সহায়তায় গোস্তা তার জীবনের আদর্শ সফল করতে সক্ষম হল। এই উপন্যাসটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-সুইডেনের সমাজ জীবনের এপিক।

৪৮। Lamb, Charles 1775-1834 : Essays of Elia.

কতকগুলি মধুর রচনার সঙ্কলন। "Humanly appealing in their utter frankness and naturalness, whimsical in their humour."

৪৯। Laxness, Halldor Kiljan 1902- : Salka Valka.

আইসল্যাণ্ডের একটি দরিদ্র কুশ্রী তরুণীর জীবনের করুণ ইতিহাস। সালকার চরিত্র পাঠকের মন অভিভূত করে রাখে।

৫০। Lewis, Sinclair 1885-1951 : Arrowsmith.

মূঢ়, দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের বাধা উপেক্ষা করে তরুণ ডাক্তার মার্টিন অ্যারোস্মিথের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আত্মনিয়োগের বলিষ্ঠ কাহিনী।

৫১। Machiavelli, Niccolo 1469-1527 : The Prince.

রাজা, ডিক্টেটর, স্বৈরাচারী শাসকদের জন্য ম্যানুয়েল। মূল কথা হল প্রজার অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র প্রজার জন্য নয়; এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোন উপায়ই সমর্থনযোগ্য। পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই বই বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে।

৫২। Malthus, Thomas R. 1766-1834: An Essay on the Principles of Population.

প্রায় ১৬০ বছর পূর্বে মালথাস আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, খাদ্য সরবরাহ যে পরিমাণ বাড়ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তার চেয়ে বেশী। বর্তমানে তাঁর মতবাদ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও এই বই আমাদের নতুন কথা ভাবতে শিখিয়েছে।

৫৩। Mann, Thomas 1875-1955 : Magic Mountain.

এক স্বাস্থ্যনিবাসকে কেন্দ্র করে রচিত বিরাট রূপক উপন্যাস। "Touching upon almost all ideas and issues of the twentieth century, from psychoanalysis to relativity, from Eastern dogmatism to Western liberalism, The Magic Mountain is one of the most gigantic works of modern world literature."

৫৪। Martin du Gard, Roger 1881-1959 : The World of the Thibaults.

এই সুদীর্ঘ ফরাসী উপন্যাসে থিবো পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবারের সমৃদ্ধির সময় কাহিনীর শুরু; আর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শেষ দুই বংশধরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। "By far the greatest piece of fiction done in our time."—Atlantic.

৫৫। Marx, Karl 1818-'83 : Capital.

মার্ক্স এই গ্রন্থে অর্থনীতি, শ্রমিক ও বেতন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের উপর যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্বসাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ মার্ক্সের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। কম্যুনিস্টদের "বাইবেল" বলা হয়।

৫৬। Maugham, W. Somerset 1874- : Of Human Bondage.

নায়ক ফিলিপ কেরীর জীবনের ত্রিশ বছরের কাহিনী। নানা দুঃখ, দারিদ্র্য এবং ভালবাসার আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে শান্ত জীবনের দ্বারে পৌঁছবার চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

৫৭। Maupassant, Guy de 1850-'93 : Stories.

বস্তুতান্ত্রিক, রসোজ্জ্বল গল্প।

৫৮। Melville, Herman 1819-'91 : Moby Dick.

তিমি শিকারের চাঞ্চল্যকর গল্প। কিন্তু শুধুই গল্প নয়, রূপকও আছে কাহিনীর

পশ্চাতে। মবি ডিক সাদা হিংস্র তিমি মাছ। কাপ্তেন আহাবের একটি পা সে কামড়ে নিয়েছে। কাপ্তেন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাকে খুঁজে বার করবেই। 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'-র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। "Considered one of the greatest novels in the history of American literature and the literature of the world."

৫৯। Milton, John 1608-'74 : Paradise Lost.

প্রাচীন যুগের পর রচিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এপিক কাব্য। শয়তানের প্রলোভনে স্বর্গ থেকে মানুষের পতনের কাহিনী।

৬০। Moliere 1622-'73 : Tartuffe.

বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার সমাজের দোষত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমেডি রচনা করেছেন। Tartuffe তাঁর শ্রেষ্ঠ কমেডি। এখানে তিনি ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করেছেন।

৬১। Montaigne, Michel Eyquem de 1533-'95 : Essays.

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রথম নিদর্শন। প্রথম, কিন্তু রসসমৃদ্ধ। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন। শেক্সপীয়র, বেকন প্রমুখ বহু লেখক এই রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

৬২। Nexo, Martin Andersen 1869- : Pelle the Conqueror.

পেলে কার্লসন নামক একজন চাষী কি করে শ্রমিক নেতা হয়ে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য কি ভাবে সংগ্রাম করেছে তারই কাহিনী। শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব প্রধান হলেও পেলের জীবনের গল্প হারিয়ে যায়নি। নায়ক শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসায় বিশ্বাসী, সুতরাং শান্তির পরিবেশেই কাহিনী শেষ হয়েছে। দিনেমার লেখকের এই উপন্যাস সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেন: "One of the great novels of the world."

৬৩। Nietzsche, F.W. 1844-1900 : Thus Spake Zarathustra.

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নীটশে অতিমানবতত্ত্বের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে বহু লেখক এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

৬৪। O' Neill, Eugene 1888-1953 : Anna Christie.

সামুদ্রিক জীবনের পটভূমিকায় আন্নার নবজীবন প্রাপ্তির কাহিনী। বহু সম্বর্ধিত নাটক।

৬৫। Pascal, Blaise 1623-'62 : Pensées (Thoughts)

ফরাসী গণিতবিজ্ঞানীর ভাবনার টুকরোগুলি মুক্তোর মত এ বইয়ের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। জীবনের সকল বিষয় সম্বন্ধেই তাঁর ভাবসমৃদ্ধ মন্তব্য আছে। এদের অনেকগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত।

৬৬। Plato 427-347 B.C. : The Republic.

দার্শনিকদের দ্বারা শাসিত আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রের আলোচনায় এখনো এ বই অপরিহার্য।

৬৭। Poe, Edgar Allan 1809-'49 : Tales.

আমাদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে পো লেখেননি। অদ্ভুত কল্পনার রঙে তাঁর নিজস্ব জগৎ উজ্জ্বল ; সে জগৎ রহস্যময়, ভয়ঙ্কর এবং অর্ধপরিচিত ; তথাপি সুন্দর এবং তার আকর্ষণ এড়ানো দায়। এই গল্পগুলি ফরাসী কবি বোদলেয়ারকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

৬৮। Proust, Marcel 1871-1922 : Remembrance of Things Past.

সাত খণ্ডে রচিত ফরাসী উপন্যাস। তিনটি পরিবারের কাহিনী। ফরাসী অভিজাত সমাজের নিখুঁত চিত্র। Swann's Way খণ্ডটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

৬৯। Pushkin, Alexander Sergeyevich 1799-1837 : Poems.

রাশিয়ার প্রথম জাতীয় কবি। "...author of countless short poems remarkable for their perfection and clarity."

৭০। Rabelais, Francois 1495 (?)-1553 : Gargantua and Pantagruel.

দুই দৈত্যের (পিতা-পুত্র) কাহিনী। প্রচুর আমোদ, স্ফূর্তি ও হাসির কাহিনী। কোথাও কোথাও অশ্লীলতা আছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাসি-ঠাট্টার পশ্চাতে একটি উদ্দেশ্য আছে লেখকের। মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে যারা বিকৃত করেছে সেই শিক্ষক, আইনজীবী, পাদ্রি, জবরদস্ত শাসক প্রভৃতিকে পরোক্ষে লেখক কশাঘাত করেছেন।

৭১। Reade, Charles 1814-'84 : The Cloister and the Hearth.

হল্যাণ্ডের শিল্পী গেরার্ডের জীবনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস। পঞ্চদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালীর সমাজের পটভূমিকায় একটি প্রেমের

গল্প বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই বই ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৭২। Rolland, Romain 1866-1944 : Jean Christophe.

এক সঙ্গীতশিল্পীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের কাহিনী। সহানুভূতিহীন সংসারের বিরুদ্ধে শিল্পীর সংগ্রামের ও শান্তিলাভের ইতিহাস।

৭৩। Romains, Jules 1885- : Men of Good Will.

চৌদ্দ খণ্ডের এক বিরাট পারিবারিক উপন্যাস। ১৯০০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ফ্রান্সের সামাজিক চিত্র। Verdun খণ্ডটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

৭৪। Rousseau, Jean Jacques 1712-'78 ; Confessions.

বিশ্বসাহিত্যের অনন্যসাধারণ আত্মজীবনী। কিছুই গোপন না রেখে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করবার সাহস তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। উপন্যাসের মত পড়া যায়।

৭৫। Russell, Bertrand 1871- : History of Western Philosophy.

"The masterwork of the ablest philosopher of our day." —Haines.

৭৬। Schopenhauer, Arthur 1788-1860 : The World as Will and Idea.

জীবন দুঃখময়। মানুষের বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষাই দুঃখকে শক্তিশালী করে। মানুষ না বাঁচলে দুঃখ কাকে অবলম্বন করবে? সুতরাং বেঁচে থাকবার ইচ্ছাই দুঃখের মূল। দুঃখময় জীবন সহনীয় করা যেতে পারে শিল্পচর্চা করে এবং অন্তরের নীতিবোধকে দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করে। বহু লেখকের রচনা প্রভাবান্বিত করেছে।

৭৭। Schweitzer, Albert 1875- : Out of My Life and Thought.

মানব-সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক মনীষীর আশ্চর্য আত্মজীবনী। "This book is a stirring lesson in the humanities."

৭৮। Shakespeare, William 1564-1616 : Othello.

ওথেলো ও ডেসডিমোনার মর্মস্পর্শী ট্রাজেডি। অনেকের মতে ওথেলো শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটক।

৭৯। Shaw, George Bernard 1856-1950 : Saint Joan.

দৈববাণী শুনে সাধারণ ঘরের মেয়ে জোয়ান কেমন করে চরম বিপর্যয়ের দিনে

ফ্রান্সের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল, এবং কেমন করে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল—তারই নাট্যরূপ। কোনও বিশেষ তত্ত্ব প্রচারের যে আগ্রহ শ-র অন্যান্য নাটকে দেখা যায় এখানে তা গৌণ; বড় হয়ে উঠেছে জোয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা। জোয়ানের সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

৮০। Shelley, Percy Bysshe 1792-1822 : Poems.

বড় কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেও লিরিক কবিতাই শেলীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বহন করে। কল্পনা ও সঙ্গীতের ঐশ্বর্য ছাড়া সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির পিপাসা শেলীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

৮১। Sholokhov, Mikhail 1905- : The Quiet Don.

তিন খণ্ডে ডন কসাক জাতির ১৯১০-২০ সনের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত এপিক উপন্যাস। বস্তুতান্ত্রিক কাহিনী। সতেরো সালের বিপ্লবের পটভূমিকায় কাহিনী বলা হয়েছে। বিভিন্ন নামে কয়েক খণ্ড অনুবাদ হয়েছে।

৮২। Sienkiewicz, Henryk 1846-1916 : Quo Vadis.

পোলিশ ভাষায় রচিত বিশেষ জনপ্রিয় উপন্যাস। নিরোর শাসনকালে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচারের কাহিনী। লিগিয়া নামে এক খ্রীষ্টান তরুণীর এক প্যাগান যুবকের প্রতি প্রেমকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচিত হয়েছে।

৮৩। Sophocles 496-406 (?) B. C. : Oedipus the King.

সফোক্লিসের শ্রেষ্ঠ নাটক। "Structurally the play is unrivalled in dramatic literature." ঈডিপাস ট্রিলজির কাহিনী থেকে "ঈডিপাস কমপ্লেক্সের" তত্ত্ব প্রথম মনোবিজ্ঞানীদের মনে জেগেছিল।

৮৪। Stendhal 1783-1842 : The Red and the Black.

ফরাসী সাহিত্যের প্রথম বস্তুতান্ত্রিক ও মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। ভাগ্যান্বেষী জুলিয়েন সোরেলের কাহিনী। সামরিক শক্তিকে 'লাল' বলা হয়েছে, এবং 'কালো' বোঝায় গির্জার ক্ষমতা। সোরেল বুঝেছিল নেপোলিয়নের পর ভাগ্যোন্নতির জন্য পাদ্রিদের দ্বারস্থ হতে হবে। কাহিনীর নামকরণে এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৮৫। Swift, Jonathan 1667-1745 : Gulliver's Travels.

প্রবীণ ও কিশোর উভয় শ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমাদৃত হয়ে আসছে। প্রবীণদের ভাল লাগে এর তীব্র বিদ্রূপ; ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে রূপকথার মত গল্প। সুইফ্‌টের ভাষা বহুদিন আদর্শ ইংরেজী গদ্য হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে।

৮৬। Thackeray, William Makepeace 1811-'63 : Vanity Fair.

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইংলণ্ডের সামাজিক কাহিনী। ঈর্ষাপরায়ণ বেকি শার্পের চরিত্র সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

৮৭। Thoreau, Henry David 1817-'62 : Walden.

যন্ত্রযুগের জীবনযাপনে ক্লান্ত লেখকের আত্মজীবনী। "A book for those who love nature, for those who love courageous thinking, courageous acting and all sturdy, manly virtues."

৮৮। Thucydides 470-400 (?) B. C. : History of the Peloponnesian War.

এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস। মেকলে বলেছেন: "There is no prose composition in the world that I place so high as the seventh book of Thucydides."

৮৯। Tolstoi, Count Leo 1828-1910 : War and Peace.

নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত রাশিয়ার জীবনযাত্রার মিছিল। কোনও কোনও সমালোচকের মতে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

৯০। Toynbee, Arnold Joseph 1889- : Study of History.

এগারো খণ্ডের বিরাট বই। ১৯৬১ সনে সম্পূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস। "A major contribution to modern thought." দুই খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পাওয়া যায়।

৯১। Turgeniev, Ivan 1818-'83 : Virgin Soil.

১৮৭০ সনের রাশিয়ান বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস। "...One of the most important books connected with the struggle against Russian autocracy."

৯২। Undset, Sigrid 1882-1949 : Kristin Lavransdatter.

নরওয়ের চতুর্দশ শতকের ধর্ম ও সামাজিক জীবনে একটি নারীর কন্যা, প্রণয়িনী, স্ত্রী এবং মাতৃত্বের ক্রমবিবর্তিত অভিজ্ঞতা। রোমান ক্যাথলিক ধর্মাদর্শের প্রাধান্য।

৯৩। Virgil 70-19 B. C. : Aeneid.

ইতালীর জাতীয় এপিক। ট্রয়ের পতনের পর রোমে প্রত্যাবর্তনের পথে ঈনিয়াসের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা।

৯৪। Voltaire 1694-1778 : Candide.

ভলতেয়ারের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। "...A masterpiece of satire on optimism, war, conventional religion, governments, and love of money."

৯৫। Wells, Herbert George 1866-1946 : Outline of History.

১৯২৪ সনে বিংশ শতাব্দীর দশটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য যে ভোট নেওয়া হয় তাতে সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল এ বই। "...plain history of life and mankind."

৯৬। Whitman, Walt 1819-'92 : Leaves of Grass.

এই কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে ইমার্সন বলেছেন: "the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed."

৯৭। Wordsworth, William 1770-1850 : Poems.

প্রকৃতিপ্রেম, মানবিকতা, সমাজের নীচুস্তরের লোকের জন্য গভীর সহানুভূতি এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৯৮। Yeats, William Butler 1865-1939 : Collected Poems.

"The poetry of Yeats...is steeped in Irish legend and history, and deeply tinged with oriental philosophy and religious mysticism."—Haines.

৯৯। Zola, Emile 1840-1902 : Germinal.

কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাস। জোলার শ্রেষ্ঠ রচনা।

১০০। Zweig, Stefan 1881-1942 : Kaleidoscope I & II.

সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানমূলক চিত্তাকর্ষক গল্পসংগ্রহ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও কলা-নৈপুণ্যে পরম উপভোগ্য।

# গান্ধীজীর পাঠ-চর্চা

গান্ধীজী তাঁর আত্মকথায় বলেছেন : "বিদ্যাভ্যাস কালে আমি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছুই পড়ি নাই বলা যায়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরও খুব কমই পড়িয়াছি। এমন কি আজও একথা বলা যায় যে, আমার পুস্তকের জ্ঞান খুবই কম। এই অনায়াসলব্ধ বা বাধ্যতামূলক সংযম দ্বারা আমার ক্ষতি হয় নাই বলিয়াই আমি মনে করি। যে অল্পস্বল্প পুস্তক পড়িয়াছি তাহা আমি ভাল রকম হৃদ্গত করিয়াছি একথা বলা যায়।"

গান্ধীজী জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি নিজের জীবনকে দেখেছেন সত্যের পরীক্ষা হিসাবে। নিজের অভিজ্ঞতা অথবা চিন্তাধারার সমর্থন কোনো বই থেকে পেলে তিনি নতুন প্রেরণা লাভ করতেন। ভালো বই তাঁর কাছে ছিল প্রতিভার দীপশলাকা। মহৎ চিন্তার সংস্পর্শে এসে পাঠকের মন উজ্জীবিত হয়; চারপাশে যখন সংশয় ও অবিশ্বাস তখন একটি ভালো বই প্রত্যয়ের সঞ্জীবনী নিয়ে আসে। যে-সব বই গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্ম প্রভাবান্বিত করেছে তাদের ঋণ তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। এই সব বইয়ের কথা আলোচনা করলে গান্ধীজীর চিন্তাধারার ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস স্পষ্টতর হবে। তাছাড়া চিন্তাক্ষেত্রে গান্ধীজীর সমধর্মী কারা ছিলেন তা-ও পাঠপঞ্জী থেকে জানা যেতে পারে। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে-সব লেখকের মিল আছে শুধু তাঁদের বই-ই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। গান্ধীজীর মনের ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল; তাই রাস্কিন কিংবা টলস্টয়ের বই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। এ ছাড়াও কত ভালো বই হয় ত গান্ধীজীর হাতের কাছেই ছিল। কিন্তু তারা গান্ধীজীকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজী মার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' পড়েননি। পরে পড়েছেন বলে শুনেছি; কিন্তু এ বই নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি।

তবে গান্ধীজী যত কম বই পড়েছেন বলেছেন গ্রন্থজগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রকৃতপক্ষে তত কম ছিল না। তাঁর পিতার বইয়ের জ্ঞান অপেক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞান

ছিল আধক। তাই ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্য বইয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কেউ ছিল না। লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়বার সময় (১৮৮৮-১৮৯১) নানা লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়তে আরম্ভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবার সময়ও তাঁর বই পড়বার সুযোগ হয়েছে। ভারতে ফিরে তিনি কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন থেকে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত পুথি-পত্রই তিনি প্রধানতঃ পড়েছেন। সময়ের অভাবে অন্যান্য বই বড় বিশেষ পড়তে পারেননি। জেলে যখন বাধ্যতামূলক অবসর লাভ করেছেন তখন কিছু কিছু বই পড়বার সুযোগ পেয়েছেন।

বিচিত্র ধরনের বই সম্বন্ধে যে গান্ধীজীর আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাদেব দেশাইর দিনলিপি থেকে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যখন যারবেদা জেলে ছিলেন তখন গান্ধীজী জানতে চান জেল লাইব্রেরিতে স্কট, মেকলে, জুলে ভার্ন, ভিক্টর হুগোর বই এবং কিংসলির 'ওয়েস্ট ওয়ার্ড হো' এবং গ্যেটের 'ফাউস্ট' আছে কি না। লাইব্রেরি থেকে এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের 'অ্যাডাম্‌স পীক টু এলিফ্যান্টা' এবং নিবেদিতার 'ক্র্যাড্‌ল্‌ টেল্‌স্‌ অব হিন্দুইজম্‌' তাঁকে এনে দিতে বলেন। গান্ধীজী আরও বলেন যে, আফ্রিকার জেলে তিনি প্রথম স্টিভেনসনের 'দি স্ট্রেঞ্জ কেস্‌ অব ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড' পড়েছেন। জেল লাইব্রেরিতে স্টিভেনসনের 'ভার্জিনিবাস পুয়েরিস্ক' ( 'বালক-বালিকাদের জন্য'—প্রবন্ধের বই ) আছে জেনে গান্ধীজী বললেন, এই বই নিশ্চয়ই পড়বার যোগ্য।

ছেলেবেলায় সাধারণ স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া অন্য কিছু পড়বার আগ্রহ গান্ধীজীর ছিল না। পাঠ্যতালিকার বাইরে যে বই সর্বপ্রথম তাঁকে আকৃষ্ট করে সেটি হল 'শ্রবণের পিতৃভক্তি।' এই নাটকটি তাঁর বাবা কিনেছিলেন। বইটি তিনি পড়েছিলেন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে। এর পরে আর কি কি বই তিনি পড়েছিলেন তা জানা যায় না।

নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয় লণ্ডনে। ইংলণ্ড প্রবাসের এক বছর পরে গান্ধীজীর দু'জন থিয়োসফিস্টের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরা গান্ধীজীকে গীতা পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি তখনো মূল সংস্কৃত অথবা গুজরাটী অনুবাদে গীতা পাঠ করেননি। এই থিয়োসফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তিনি প্রথম গীতা পাঠ আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ গীতা তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়ে। গান্ধীজীর জীবনে গীতার প্রভাব অসামান্য। তিনি বলেছেন, "তখন আমার মনে হইল যে, ভগবদ্গীতা অমূল্য গ্রন্থ। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উহাকেই

আমি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। আমার নিরাশার সময় ঐ গ্রন্থ হইতে অমূল্য সাহায্য পাইয়া থাকি।"

গান্ধীজী গীতার প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য ইংরেজী অনুবাদই পড়ে ফেললেন। এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদ Song Celestial তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে গীতার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন আর্নল্ডের অনুবাদের মাধ্যমে। কারণ প্রথমে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান মূল গ্রন্থের মর্ম গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

এডুইন আর্নল্ডের বুদ্ধচরিত বা 'দি লাইট অব এশিয়া' কাব্যজীবনীও এই সময় তিনি পড়েন। গান্ধীজী বলেছেন, এ বই তিনি ভগবদ্গীতার চেয়ে অধিক আনন্দের সঙ্গে পড়েছেন, এবং বই হাতে নিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামতে পারেননি।

আর্নল্ডের অন্যান্য বইও গান্ধীজী পড়েছিলেন মনে হয়। তাই দেখি তিনি মীরা বেনকে আর্নল্ডের 'ইণ্ডিয়ান ইডিল্‌স্‌' ও 'পার্ল্‌স্‌ অব ফেথ' পড়তে উপদেশ দিয়েছেন।

উপরে যে থিয়োসফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা বলেছি তাঁদের অনুরোধে গান্ধীজী মাদাম ব্লাভাটস্কির 'কী টু থিয়োসফি' পড়েন। এই বই পড়বার ফলে গান্ধীজীর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় বই পড়তে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার পরিণামস্বরূপ তিনি একে একে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, উপনিষদ, মনুস্মৃতি প্রভৃতি আত্মস্থ করে ফেললেন। অবশ্য সবই তিনি লণ্ডনে পড়েননি। তবে পড়ার সূত্রপাত হয় ঐ সময় থেকেই। তুলসীদাসের রামায়ণ ভগবদ্গীতার মতোই গান্ধীজীর নিকট ছিল আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস। এ ছাড়া পড়েছেন পুরাণ। গান্ধীজীর মতে পুরাণের মধ্যে আছে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস। রমেশচন্দ্র দত্তের রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এবং গ্রিফিথের রামায়ণের অনুবাদ পাঠ করবার জন্য গান্ধীজী মীরা বেনকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইবেলও পড়তে আরম্ভ করলেন গান্ধীজী। ওল্ড টেস্টামেণ্ট তাঁর বিশেষ ভালো লাগেনি। কিন্তু নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করল। 'সারমন অন দি মাউণ্টের' শিক্ষা তাঁর হৃদয়ে সাড়া জাগাল। এক গালে চড় মারলে আর এক গাল এগিয়ে দেবার উপদেশ গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে

সমর্থন করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, গীতা, আর্নল্ডের বুদ্ধচরিত এবং যিশুর উপদেশের মধ্যে ঐক্য সুস্পষ্ট। সকল ধর্মেরই মূল কথা ত্যাগ।

এর পর মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে জানবার জন্যও গান্ধীজীর আগ্রহ হয়। টমাস কার্লাইলের 'অন হিরোজ' ( On Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History ) পড়ে জানতে পারলেন মহম্মদের বীরত্ব, মহত্ব ও সাধনার কথা। ওয়াশিংটন আরভিং রচিত Mahomet and His Successors পড়েও গান্ধীজী মহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। সেল কর্তৃক অনূদিত কোরাণ কিনে পড়তে আরম্ভ করেন। পিকথলের অনুবাদও তিনি পরে পড়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছেন। গ্রাহামের সৈয়দ আহমেদ খাঁর জীবনী; হাণ্টারের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্‌'; ক্যাণ্টওয়েল স্মিথের 'মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। আমীর আলির 'স্পিরিট অব ইসলাম' গুজরাটীতে অনুবাদ করবার ইচ্ছাও গান্ধীজীর হয়েছিল।

পার্শীদের ধর্মবিশ্বাসের সহিত পরিচিত হবার জন্য এই সময় তিনি 'জরথুস্ত্রের বাণী' নামে একটি বই পড়েছিলেন। কয়েকজন খ্রীষ্টান বন্ধুর অনুরোধে তাঁকে পড়তে হয়েছিল কয়েকটি প্রচারধর্মী খ্রীষ্ট ধর্মবিষয়ক বই। এদের মধ্যে পিয়ার্সনের Many Infallible Proofs তাঁর ভালো লেগেছিল। বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবার ফলে গান্ধীজী জোসেফ বাটলারের 'দি অ্যানালজি অব রিলিজিয়ন' আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছিলেন।

লণ্ডনে নিরামিষাশী হবার ফলে অনেকেরই তাঁর উপর দৃষ্টি পড়ে, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত অনেকেই তাঁকে খাদ্য পরিবর্তন করতে বলেন। মাংস খাবার সমর্থনে কেউ কেউ বেন্থামের 'থিয়োরি অব ইউটিলিটি' তাঁকে পড়তে বলেন। তাঁর কাছে বেন্থামের ভাষা খুব কঠিন মনে হয়েছিল। গান্ধীজী নিজেও খাদ্য নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেন। তিনি নিরামিষ আহার এবং খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সল্ট, হাওয়ার্ড উইলিয়াম্‌স্‌ ও আন্না কিংসফোর্ডের বই পড়েছিলেন। খাদ্য ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা নিয়ে গান্ধীজী সারা জীবন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে তিনি আরো অনেক বই পড়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী জাস্টের 'রিটার্ণ টু নেচার' বইটি পড়ে প্রাকৃতিক চিকিৎসার মূল নীতিগুলি নিজের উপর প্রয়োগ করেছিলেন।

গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ও ভাবজীবনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। নানা সংঘাতের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর জীবনদর্শন গড়ে উঠছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন ভারতে তাঁর ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব। এই প্রস্তুতি পর্বে তিনি কয়েকটি পুস্তকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ম্যাক্সমূলারের 'ভারত আমাদের কি শিক্ষা দিতে পারে' বইটি পড়ে সভ্যতার শাশ্বত বাণী সম্বন্ধে নতুন করে তিনি আগ্রহান্বিত হন। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'ও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই পড়েন। লণ্ডনে থাকতেই গান্ধীজী কনজারভেটিভ দলের মিঃ পিঙ্কাটের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আইন ব্যবসায়ের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্য। শুধু আইনের বই পড়লেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায় না। মিঃ পিঙ্কাট তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে বললেন, তোমার সাধারণ পড়াশুনা খুবই কম।…ভারতের ইতিহাস পর্যন্ত তুমি পড়োনি।

মিঃ পিঙ্কাট ম্যালিসন রচিত ১৮৫৭ বিপ্লবের ইতিহাস পড়বার উপদেশ দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তা পালন করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। এ বই থেকে তিনি কিছু তথ্য জেনেছেন, কিন্তু তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী হেনরি ডেভিড থোরো, জন রাস্কিন এবং লিও টলস্টয়ের রচনার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হন। এই প্রভাবের চিহ্ন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মধারার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছে।

থোরোর 'সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স' পড়ে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের সমর্থন পান। থোরোর মূল কথা হল এই যে, যে গভর্নমেণ্ট সবচেয়ে কম শাসন করে সেই গভর্নমেণ্ট সবচেয়ে ভালো। থোরো কর দিতে অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না বলে গান্ধীজীর মনে হয়েছে। তাছাড়া থোরো সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অসহযোগের নীতি কার্যকর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তথাপি থোরোর পুস্তিকাটি সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচারে বিশেষরূপে সহায়ক হয়েছে। গান্ধীজী 'সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স'-কে 'মাস্টার্লি ট্রিটিজ' বলে অভিহিত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন গান্ধীজী সত্যাগ্রহের আদর্শ পেয়েছেন থোরোর কাছ থেকে। কোদণ্ড রাও-এর নিকট লিখিত এক চিঠিতে গান্ধীজী এর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার আইন অমান্য আন্দোলন অনেকদূর অগ্রসর হবার পর থোরোর বই তাঁর হাতে এসেছে।

টলস্টয়ের 'দি গস্পেল ইন ব্রিফ', 'হোয়াট টু ডু' এবং 'দি কিংডম অব

গড উইদিন ইয়ু' গান্ধীজীর মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধীজী বলেছেন ঃ টলস্টয়ের 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে' বইটি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। এ বই আমার মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে।

কিন্তু রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' বইটি গান্ধীজীকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবান্বিত করেছে। সর্বোদয় কর্মসূচীর মধ্যে এ বইয়ের প্রভাব দেখা যায়। রাস্কিনের জীবনাদর্শ এখনো সর্বোদয় কর্মপন্থার প্রেরণাস্বরূপ।

গান্ধীজীর আত্মচরিতের 'পুস্তকের যাদুমন্ত্র' অধ্যায়টি পড়লেই দেখা যাবে 'আনটু দিস্ লাস্ট' তাঁর মনে কি গভীর আলোড়ন এনেছিল। নাতালের পথে গাড়িতে পড়বার জন্য পোলক গান্ধীজীর হাতে দিলেন 'আনটু দিস্ লাস্ট'। এ বই প্রথম থেকেই তাঁকে এমন মুগ্ধ করল যে, শেষ না করা পর্যন্ত তিনি থামতে পারলেন না।

'আনটু দিস্ লাস্ট' চারটি প্রবন্ধের সঙ্কলন (১৮৬০-'৬২)। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু শ্রমিকদের চাকরি ও বেতন সম্পর্কিত সমস্যা। 'কর্নহিল ম্যাগাজিনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রতিবাদ উঠল যে সম্পাদক প্রবন্ধ ছাপা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। তখন সম্পাদক ছিলেন থ্যাকারে। গান্ধীজীর মতে 'আনটু দিস লাস্টের' মূল কথা তিনটি ঃ (ক) সমাজের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ; (খ) উকিল ও নাপিতের বাঁচবার অধিকার সমান, সুতরাং তাদের পারিশ্রমিকের হার একই নীতিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত; (গ) যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের জীবনই আদর্শ জীবন।

এই আদর্শ স্বার্থের বিরোধী বলেই ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায় রাস্কিনের বিরোধিতা করেছে। তখন যদিও রাস্কিনের মত অসম্ভব কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তথাপি পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবিত অনেক সংস্কার কার্যকর করা হয়েছে।

গান্ধীজী 'সর্বোদয়' নাম দিয়ে 'আনটু দিস্ লাস্ট' গুজরাটিতে অনুবাদ করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর জনগণের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য গান্ধীজী সর্বোদয় কর্মপন্থার উপর জোর দিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে গান্ধীজী কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তাঁর পড়াশুনা করবার মতো সময় ছিল কম এবং একটি বিশেষ কাজে আত্মনিয়োগ করায় প্রধানতঃ ঐ সম্পর্কিত বই সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। অবশ্য গীতা প্রভৃতি কয়েকটি ধর্মপুস্তক ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়া অধিকাংশ বই পড়তে হয়েছে কংগ্রেসের আন্দোলন, ভারতের ইতিহাস, জনসাধারণের অবস্থা ইত্যাদি জানবার জন্য। মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া', ব্রেলস্‌ফোর্ডের 'সাবজেক্ট ইণ্ডিয়া', কেসির 'অ্যান অস্ট্রেলিয়ান ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বই তিনি পড়েছেন ভারত সম্বন্ধে বিদেশী লেখকদের মতামত জানবার জন্য। জেলে নিজের রুচি অনুযায়ী বই পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

,ভারতের জেলে গান্ধীজী পড়েছেন কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।' গিবনের 'রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস'ও তিনি পড়েছেন জেলে,—১৯২২ কি ১৯২৩ সালে।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন যারবেদা জেলে ছিলেন তখন সেখানে কি কি বই পড়েছেন তার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে তিনি মৈথিলীশরণ গুপ্তের কয়েকটি বই, কার্পেণ্টারের 'অ্যাডাম্‌স্‌ পীক টু এলিফ্যাণ্টা' এবং এডওয়ার্ড টম্পসনের 'দি আদার সাইড অব দি মেডাল' প্রভৃতি বইগুলি পড়েছেন। টম্পসনের উপর বল্লভভাই প্যাটেল বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। গান্ধীজী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, টম্পসন 'দি আদার সাইড অব দি মেডাল'-এ এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন যা এতদিন ইংরেজ ঐতিহাসিকরা গোপন করে রেখেছিল।

এই জেলে তিনি যে-সব বই পড়েছেন তার মধ্যে দু'টি বই তাঁকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল। একটি হল রাস্কিনের Fors Clavigera (Fortune, the club-bearer)। দারিদ্র্যের প্রতিকার সম্বন্ধে রাস্কিন ব্রিটিশ শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে ৯৬টি খোলা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। সেই চিঠিগুলির সঙ্কলন এ বই। গান্ধীজীর অভিমত এই যে, এ বই বারবার পড়েও মন ক্লান্ত হয় না।

আর একটি বই হল আপটন সিনক্লেয়ারের Wet Parade. সিনক্লেয়ার এই উপন্যাসে আমেরিকায় মদ্যপানের সামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাহিনীর আবেদন গান্ধীজীর অন্তর স্পর্শ করে। গান্ধীজী মন্তব্য করেছেন, "সিনক্লেয়ার সমাজের বিশেষ কল্যাণ করছেন। তিনি একটির পর একটি সামাজিক পাপের উপর আলোকপাত করে চলেছেন।" এই উপন্যাস তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে তিনি বল্লভভাই প্যাটেল ও পুত্র দেবদাসকে পড়তে বলেছিলেন। রাজাজীর কিন্তু 'ওয়েট প্যারেড' ভালো লাগেনি। তাঁর মতে এ বই শিল্পকর্ম নয়, শুধু প্রচার। গান্ধীজী তার উত্তরে লিখলেন, "মনে হয় রাজাজীর আমেরিকান লেখকদের সম্বন্ধে বিরূপতা আছে। আমি হার্ডি বা জোলার লেখা পড়িনি। কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ারও অবজ্ঞা করবার মতো লেখক নন।

শুধু প্রচার আছে বলেই কোনো উপন্যাসকে উপেক্ষা করা যায় না।…'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-এ প্রচারের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; কিন্তু এর শিল্পের দিকটি অননুকরণীয়।"

গান্ধীজীর বই পড়া সম্বন্ধে আমরা উপরে মোটামুটি পরিচয় দিয়েছি। যত কম বই তিনি পড়েছেন বলে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশী বই পড়েছেন। যে-সব বই তিনি পড়েছেন তার সবগুলির নাম পাওয়া যায় না।

পাঠক হিসাবে গান্ধীজীর দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ পুস্তক নির্বাচনের জন্য তিনি নিজের মানসিক প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে যে বইয়ের যোগ আছে সে বই পড়তেই আগ্রহ ছিল। নিছক পড়বার জন্য পড়ায় উৎসাহ ছিল না। তাই রাস্কিনের শিল্প সম্বন্ধীয় বিখ্যাত রচনা বাদ দিয়ে তিনি পড়েছেন 'আনটু দিস্ লাস্ট।' টলস্টয়ের ক্লাসিক উপন্যাসগুলি অপেক্ষা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে কয়েকটি স্বল্পপরিচিত ছোট রচনা। এই রচনাগুলির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জীবনাদর্শের সামঞ্জস্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, পঠিত পুস্তকের অন্তর্নিহিত ভাবধারা তিনি হৃদ্গত করে নিতেন। থোরো, রাস্কিন এবং টলস্টয়ের জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না; নিজের জীবন ও কর্মেত াদের প্রয়োগ করেছেন

## ভারতের বাংলাভাষী

ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দেশে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাকে অনেকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি হিসাবে চিহ্নিত করে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষার সঙ্গে যে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে সে কথা এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে তা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন নেই। তবে ভাষা সমস্যার একটি দিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হবে।

ভাষা সমস্যার দু'টি দিক। একটি হল, রাজ্যে কোন্ ভাষাটি প্রাধান্য লাভ করবে; আর দ্বিতীয়টি হল, এক অঞ্চলের অধিবাসী যখন অন্য অঞ্চলে কর্মোপলক্ষে বসবাস করে তখন তাদের মাতৃভাষা কতটা মর্যাদা পাবে। কর্মোপলক্ষে যাঁরা অন্য অঞ্চলে যান তাঁদের সমস্যা তত গুরুতর নয়। কেননা, তাঁরা অস্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু যাঁরা স্থায়ীভাবে কোনো পৃথক ভাষা-অঞ্চলে বসবাস করেন মাতৃভাষা নিয়ে তাঁদের যে সমস্যা তার সফল সমাধান এখনও হয়নি। আমাদের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার নেই। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে না হলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং মাতৃভাষার চর্চাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের সূত্র বাংলা ভাষা। এই সূত্রটি যদি ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে বাংলার বাইরে যে-সব বাঙ্গালী আছেন তাঁদের আমরা হারাব। হারালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষতি হবে।

ক্ষতি কতটা হবে সে বিষয়ে ধারণা করতে হলে প্রবাসী বাঙ্গালীর একটা হিসাব নেওয়া প্রয়োজন। হিসাবটা পুরনো,—রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বেকার। তাই পুরনো রাজ্যগুলির নামই দেওয়া হল:

| রাজ্য | বাংলাভাষী | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | মোট |
| আসাম | ৯,২৫,৫৩৯ | ৭,৩৯,৬১৬ | ১৬,৬৫,১৫৫ |
| আন্দামান | ১,৪৩৮ | ৯২৫ | ২,৩৬৩ |
| উত্তর প্রদেশ | ৩৯,৮৪১ | ৩৩,২০৪ | ৭৩,০৪৫ |

| রাজ্য | বাংলাভাষী | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | মোট |
| উড়িষ্যা | ৪৩,৫৪৪ | ৪২,৫৩৯ | ৮৬,০৮৩ |
| ত্রিপুরা | ২,০০,৭৫৮ | ১,৭৪,২৭৭ | ৩,৭৫,০৩৫ |
| দিল্লী | ৯৫৬ | ৯,৩৫৯ | ১০,৩১৫ |
| পাঞ্জাব (পূর্ব) | ১,৭৮৪ | ৯,৫৯৩ | ১১,৩৭৭ |
| পেপস্থ | ৩ | ৬ | ৯ |
| বিহার | ৮,৯৪,১৯২ | ৮,৬৫,৫২৭ | ১৭,৫৯,৭১৯ |
| বিন্ধ্য প্রদেশ | ৩৪৭ | ৩৩৪ | ৬৮১ |
| বোম্বাই ( সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ সহ ) | ১০,৬২১ | ৪,৯৩৩ | ১৫,৫৫৪ |
| মধ্য প্রদেশ | ১৩,৬৮৮ | ১০,১২৭ | ২৩,৮১৫ |
| মধ্য ভারত ও ভূপাল | | | ১,৯৪৭ |
| মণিপুর | | | ২,৮৫৯ |
| মহীশূর | ১,৯১৪ | ৪৩৯ | ২,৩৫৩ |
| মাদ্রাজ | ২,৩৩৪ | ১,১০৪ | ৩,৪৩৮ |
| রাজস্থান ও আজমীর | ১,৬২৭ | ১,১৪৮ | ২,৭৭৫ |
| হায়দরাবাদ | ৪৮৭ | ২৯৪ | ৭৮১ |
| হিমাচল প্রদেশ | ১০ | ৮ | ১৮ |
| | | মোট | ৪০,৩৭,৩২২ |

উপরের হিসাব সম্পূর্ণ নয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ( বর্তমান কেরালা ) বাংলা-ভাষীর সংখ্যা পাওয়া যায়নি। সংখ্যা এত কম যে তা পৃথক ভাবে দেখাবার প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষ অনুভব করেননি। দিল্লীতে বাংলাভাষী পুরুষের সংখ্যা মাত্র ৯৫৬, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দিল্লী ও পাঞ্জাবে বাংলাভাষী নারীর সংখ্যাধিক্যটাও কৌতূহলজনক। বাঙ্গালী মেয়েরা কি পাঞ্জাবে বউ হয়ে গেছে? যাই হোক, ত্রুটিপূর্ণ হলেও সেন্সাসের তথ্য থেকে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাবে। আরও একটা কথা। ত্রিপুরা ও আসামের বাঙ্গালীদের ঠিক প্রবাসী বলা চলে না। তবে বৃহত্তর অর্থে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বাংলাভাষীদের আমরা 'প্রবাসী' বলেছি।

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ২৪,১০৪,২৯৩। এদের মধ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যা ২,১০,৩৯,৬০১। বাংলা মাতৃভাষা নয় এমন ভারতীয়ের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৩৬,১৬,২৯৪। অ-ভারতীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৪৮,৩৯৮। তাহলে ভারতে মোট বাঙ্গালীর সংখ্যা দাঁড়াল ২,৫০,১৬,৯২৩। মোট বাংলাভাষীর প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকে। পাকিস্থানে বাংলাভাষীর সংখ্যা ৪,১২, ৬০,০০০-এরও বেশী। এছাড়া ব্রহ্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আরও অন্ততঃ হাজার দশেক বাংলাভাষী আছে। তাহলে ১৯৫১ সালে পৃথিবীতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৬৩,৪১,০০০।

যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয় তাদেরও অনেকে বাংলা বুঝতে, বলতে এবং ( অল্প সংখ্যক ) পড়তে পারে। এদের সংখ্যা প্রায় ২০,৫৫,০০০। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা যায় যে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা জানে তারাই সবচেয়ে বেশী। নীচে প্রধান ভাষা-ভাষীদের ক'জন বাংলা জানে তার একটা হিসাব দেওয়া হল :

| মাতৃভাষা | বাংলা জানে | মাতৃভাষা | বাংলা জানে |
|---|---|---|---|
| হিন্দী | ৭,৪৭,২৭৩ | পাঞ্জাবী | ২,৬৭৭ |
| সাঁওতালী | ৫,৪৯,১৪২ | তামিল | ১,৬৯৮ |
| আসামী | ৩,৮৩,২৩৪ | গুজরাটী | ১,৩১৬ |
| উর্দু | ১,০২,৬২০ | মারাঠী | ৫৫৯ |
| ওড়িয়া | ৬২,৫৩৫ | মালয়ালাম | ১৭১ |
| নেপালী | ১৪,৭৮৮ | কানাড়ী | ২৭৬ |
| তেলেগু | ৩,৩৯৬ | | |

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান অ-বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে কত ছিল তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল :

| মাতৃভাষা | পুরুষ | স্ত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| সাঁওতালী | ৩,৩৬,০৬৮ | ৩,২৭,৪৪৮ | ৬,৬৩,৫১৬ |
| হিন্দী | ১০,৭১,৯৬০ | ৫,০৮,৭৬৪ | ১৫,৮০,৭২৪ |
| ওড়িয়া | ১,৪০,৮৭০ | ৪১,৭৪৮ | ১,৮২,৬১৮ |
| উর্দু | ২,৯০,০০৭ | ১,৬৭,৯৭৪ | ৪,৫৭,৯৮১ |

| মাতৃভাষা | পুরুষ | স্ত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| তেলেগু | ২৭,৩৪৬ | ২২,১৯৮ | ৪৯,৫৪৪ |
| পাঞ্জাবী | ২২,৯৯০ | ১০,৩৪১ | ৩৩,৩৩১ |
| গুজরাটী | ৬,৮৬৩ | ৮,১০৮ | ১৪,৯৭১ |
| তামিল | ৯,৬৭৫ | ৫,০৩৫ | ১৪,৭১০ |
| আসামী | ৬,৬৮৩ | ২,৭০৪ | ৯,৩৮৭ |
| মারাঠী | ৪,৩০২ | ৩,৩৪০ | ৭,৬৪২ |
| ইংরেজী | ২৩,১৯৪ | ১৫,০৮৯ | ৩৮,২৮৩ |
| চীনা | ৩,৩৮১ | ২,৩৪৮ | ৫,৭২৯ |

অ-বাংলাভাষীদের অধিকাংশই কলকাতায় বাস করে। কলকাতার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৬ ভাগ ১৯৫১ সালে ছিল বাংলাভাষী। শতকরা কুড়ি ভাগের মাতৃভাষা ছিল হিন্দী। কলকাতার মিউনিসিপাল অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল :

| মাতৃভাষা | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|
| বাংলা | ৯,৮৩,৩০৩ | ৬,৮৭,২৯৮ |
| হিন্দী | ৩,৯৩,৮৪৬ | ১,২৩,১০৭ |
| উর্দু | ১,১৫,৪০৬ | ৫৫,৯৩৩ |
| নেপালী | ১১,৫৭০ | ৪,৯৩৮ |
| ওড়িয়া | ৫০,৯২৬ | ৬,৯০৯ |
| তেলেগু | ৫,৭৪১ | ২,৫৯৯ |
| পাঞ্জাবী | ১৪,৯৯৪ | ৫,৮৬১ |
| গুজরাটী | ৫,৭৪২ | ৭,৭৯১ |
| তামিল | ৫,৩৭৫ | ২,৪৭৩ |
| আসামী | ১,৮১৮ | ৯৭২ |
| রাজস্থানী | ২,১৪৩ | ৫,৪১৮ |
| মারাঠী | ২,১৫৮ | ২,৬০৯ |
| মালয়ালাম | ১,২৩৬ | ৪৯৬ |
| চীনা | ২,৫৫৭ | ১,৯৪৩ |
| ইংরেজী | ১৫,৫৬৭ | ১১,৭২১ |

উপরে যে-সব পরিসংখ্যান দেওয়া হল তা থেকে অন্য ভাষা-ভাষীদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাংলাভাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। যে দু'টি প্রধান তথ্য পাওয়া গেল তা হল এই যেঃ (১) ভারত রাষ্ট্রের মোট বাঙ্গালীর প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ থাকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে; (২) পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-সপ্তাংশ বাংলাভাষী নয়।

হিন্দী, ওড়িয়া, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাভাষীদের অনেকে নিজ নিজ রাজ্যের বাইরে থাকে। তাদের তুলনায় প্রবাসী বাংলাভাষীদের সমস্যা পৃথক। কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাংলাভাষীরাই বাংলার বাইরে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যায়। কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গেছে তাদের সংখ্যা খুবই কম। অন্য রাজ্যে পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববঙ্গের কিছু উদ্বাস্তু পাঠানো হয়েছে। কায়িক পরিশ্রম তারাই করে। কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে এদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়। অধিকাংশ উদ্বাস্তু এর পরে বাংলার বাইরে গেছে।

প্রবাসী বাংলাভাষী ও অ-বাংলাভাষীদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, বাংলাভাষীরা যে রাজ্যে বাস করে সেখানেই উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে। মধ্যবিত্ত বাংলাভাষীরা যৌথপরিবারের বন্ধন থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছে। মজুর শ্রেণীর মতো পুরুষ একা উপার্জনের জন্য বেরিয়ে যায় না, এবং অত্যাবশ্যক ব্যয় ব্যতীত সম্পূর্ণ অর্থ যৌথপরিবারের কর্তার নামে মনিঅর্ডার করে পাঠানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক প্রাচীন প্রথার তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে পারিবারিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক আগ্রহ তার মধ্যে প্রবল। কিন্তু মজুরশ্রেণী এখনও যৌথপরিবারের কর্তার সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পৃথক পরিবার প্রতিষ্ঠা করবার মতো ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন হয়ে ওঠেনি।

এই সামাজিক কারণ ছাড়া আর্থিক কারণও বাংলাভাষীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জমির পরিমাণ কম। প্রবাসী বাঙ্গালী-দের পশ্চিমবঙ্গে জমিজমা নেই; সুতরাং আর্থিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাদের আকর্ষণ সামান্য। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা অন্য রাজ্যে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার প্রয়োজন তারা যে অনুভব করবে না তাতে আর বিচিত্র কি!

স্ত্রী ও পুরুষের আনুপাতিক হার থেকে প্রমাণিত হয় কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর লোক অন্য রাজ্যে উপার্জন করে নিজের রাজ্যে নিয়মিত টাকা পাঠায়। অর্থাৎ, যে রাজ্যে

সে অর্থ উপার্জন করে সেখানে উপার্জিত অর্থের কি পরিমাণ ব্যয় করা হয়। স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী হলে বুঝা যায় যে অন্নদাতা রাজ্যের প্রতি এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের আকর্ষণ নেই। একমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্যই তারা এসেছে ; দেশে স্ত্রী-পুত্র আছে ; উপার্জিত অর্থ তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পাঠানোই তাদের লক্ষ্য। সপরিবারে কর্মস্থলে থাকলে উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ অথবা সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট রাজ্যেই ব্যয় হয়। তার ফলে সেই রাজ্যও কিছুটা লাভবান হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার বিচার করলেই দেখা যাবে এরা প্রধানতঃ উপার্জিত অর্থ নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছে। এ রাজ্যের প্রতি এদের আর কোনো আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দীভাষী পুরুষের সংখ্যা ১০,৭১,৯৬০ ; স্ত্রী লোকের সংখ্যা ৫,০৮,৭৬৪। ওড়িয়াভাষী পুরুষের সংখ্যা ১,৪০,৮৭০ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৪১,৭৪৮। আসামী মাতৃভাষা এমন পুরুষের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৬,৬৮৩ ; স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২, ৭০৪। স্ত্রীলোকের সংখ্যার আনুপাতিক স্বল্পতা থেকেই উপলব্ধি করা যেতে পারে যে ঐ সব ভাষা-ভাষীদের এই রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই। পক্ষান্তরে আসামে বাংলাভাষী পুরুষের সংখ্যা ৯,২৫,৫৩৯ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৭,৩৯,৬১৬। উড়িষ্যায় বাংলাভাষী স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩,৫৪৪ ও ৪২,৫৩৯। বিহারে বাংলাভাষী পুরুষ ছিল ৮,৯৪,১৯২ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৮,৬৫,৫২৭। বাংলাভাষীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার পার্থক্য যে কত কম তা উপরের হিসাব থেকে দেখা যাবে। এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রবাসী বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলাভাষীদের এক বৃহৎ অংশ বাংলার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। অন্য কোনো ভাষাভাষী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাইরে এত বেশী সংখ্যায় স্থায়ীভাবে বাস করে না। পশ্চিমবঙ্গে জমির অভাব ; জীবনযাত্রার ব্যয়বাহুল্য এবং সর্বোপরি পূর্ববঙ্গ হারাবার ফলে প্রবাসী বাঙ্গালীরা কর্মস্থল যে রাজ্যে সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষীর সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজারেরও বেশী। আসাম, বিহার ও ত্রিপুরায় কিছু বাংলাভাষী কৃষক আছে। এ ছাড়া অন্য সবাই

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের প্রায় সকলেই বাংলা বইপত্র পড়তে সক্ষম,—অন্ততঃ সাক্ষর। আজকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাসী বাঙ্গালীদের উপর যে নির্ভরশীল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্য রাজ্যে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ না পেলে ক্রমশঃ তারা বাংলা ভুলে যাবে কিংবা বাংলার প্রতি আকর্ষণ হারাবে।

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। এর মধ্যে অবশ্য অ-বাংলাভাষীদেরও ধরা হয়েছে। তাদের বাদ দিলে হয়ত বাংলা-ভাষী সাক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০।৫৫ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে-সব বাংলা-ভাষী আছে খুব কম করে ধরলেও তাদের মধ্যে লাখ পঁচিশ সাক্ষর পাওয়া যাবে। সুতরাং বাংলাভাষী মোট সাক্ষরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী থাকে বাংলার বাইরে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি এই এক-তৃতীয়াংশের পৃষ্ঠপোষকতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু বাংলা ভাষা যদি অন্য রাজ্যে যথোচিত মর্যাদা লাভ না করে, বাংলাভাষীরা যদি বাংলা চর্চার সুযোগ না পায়, তাহলে এই পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরদের তুলনায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা সাধারণ ভাবে একটু ভালো। প্রবাসী বাঙ্গালীরা মাতৃভাষা ভুলে যদি অন্য কোনো ভাষা গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই। অথচ ক্ষতিটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কঠিন। বাংলাভাষীরা যেমন অন্যান্য রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, অ-বাংলাভাষীরাও যদি তেমনি পশ্চিম-বঙ্গের লোক হয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে তাহলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের হারাবার ক্ষতি পূরণ হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আকর্ষণ খুবই কম। এখানে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে; সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবার মতো সুযোগ খুবই সঙ্কীর্ণ। জমির অভাব এবং জীবনযাত্রার ব্যয়বাহুল্যই এর প্রধান কারণ। অ-বাংলাভাষীদের মধ্যে যারা স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে বাস করছে তারা অধিকাংশই থাকে কলকাতায়। এত বড় সহরে তারা অনায়াসে নিজেদের পৃথক সত্তা নিয়ে বাস করতে পারে, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোনো খোঁজ না রাখলে তাদের কিছুই যায় আসে না। ভারতের আর কোনো রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন সমস্যা নেই।

বাংলা বইপত্র যাতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিকট কলকাতার দামে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ থাকতে পারে। আর যে ২০,৫৫,০০০ অ-বাংলাভাষী বাংলা জানে

চর্চার সুযোগ সুবিধা করে দিলে তাদের মধ্য থেকেও বাংলা সাহিত্যের অনেক পৃষ্ঠপোষক পাওয়া যাবে।

কিন্তু সুযোগ কোথায় ? অ-বাংলাভাষীদের বাংলা শেখাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান প্রভৃতি পড়াবার জন্য ডিপ্লোমা কোর্স আছে। অবাঙ্গালীদের জন্য বাংলার ডিপ্লোমা কোর্স নেই।